ভাঁটফুলসূত্র

সংখ্যা ০৪ | জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ | মে ২০২১

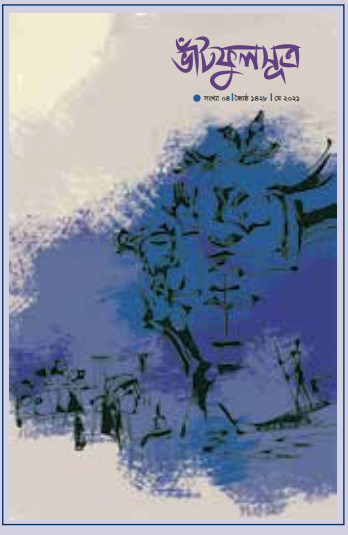

ই-সাময়িকী, সংখ্যা ০৪
জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৮, মে, ২০২১

মূল কারিগর
আমান উল্লাহ, হিরন্ময় চন্দ, মনিরা রহমান মিঠি, রফিক জিবরান, সাদাত সায়েম

শিল্পনির্দেশনা ও অঙ্গসজ্জা
হিরন্ময় চন্দ

প্রচ্ছদ
স্বপ্ন বুনন ও অপেক্ষার প্রহর

: ভাঁটফুলসূত্র

ভাঁটফুল
১১৯/২, উপশহর, রাজশাহী, বাংলাদেশ
ই-মেইল: bhatphul.pub@gmail.com
ওয়েবসাইট: www.bhatphul.com

সৃষ্টিশীলতা মানুষকে শক্তি দেয়; পথও দেখায়। সাহিত্য ও শিল্পকর্ম যেমন ব্যক্তি ও সমষ্টির আবেগ, বোধি ও প্রজ্ঞার সরাসরি কিংবা প্রতীকী প্রকাশ যা ক্রমাগত দূরে সরে যাওয়া মুহূর্তগুলিকে স্পর্শ করতে চায়। তেমনি ধ্বনির অর্থময় কিংবা আপাত অর্থহীন প্রকাশও শব্দকে শক্তিতে পরিণত করতে পারে, বিশেষত সংগীত ও কবিতায়। মানুষের প্রাত্যহিক শব্দভাণ্ডার থেকে জীবন ও প্রকৃতির চিত্রকল্প আঁকতে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন কবি অতিব্যবহৃত শব্দকেও ভিন্ন দ্যোতনায় হাজির করেন এবং চলমান জীবনের সম্পর্ক ও বিরোধকে পুন:সৃজন করেন মহত্তর বোধিচক্রে। এ কারণেই হয়তো শিল্প ও সাহিত্যকর্ম প্রজ্ঞার সারাৎসার হয়েও অপ্রতিরোধ্য ইঙ্গিতময়তায় সৃষ্টি-পথের প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করতে সচেষ্ট; আর তা অনিবার্যভাবেই নতুন পথ ও অভিব্যক্তির সৃষ্টি করে।

এই বৈশ্বিক মহামারীকালে মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপদগ্রস্ত; এ সংকট একদিন কেটে যাবে, মানুষের প্রাণশক্তিকে স্তব্ধ করতে পারবে না কখনোই। বাস্তবের মানুষ কখনো পাখি হয়ে উড়তে চায়, খণ্ড খণ্ড দৃশ্যকল্পে অখণ্ড আকাশের জন্যও কাতর হয়।

ভয় ও মারীর ভেতরে জীবনতৃষার পরশে জেগে আছি আমরা।

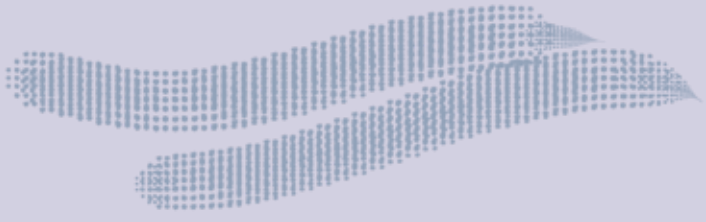

সূচি

কবিতা

সরকার মাসুদ
অন্ধকারে
শীতের রচনা
আমি ভাবি
রাত শেষে ভোর আর হবে না কোনোদিন
কেন

বেনজামিন রিয়াজী
স্তিমিত সূর্যের সাথে

অনীত রায়
শিরোনামহীন ১
শিরোনামহীন ২
শিরোনামহীন ৩

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
বসন্তদিন
ফুল
গাছ
তোমাদের কথা
ঝড়

রওশন রুবী
ঘোষ বাড়ির ময়না

সুস্মিতা চক্রবর্তী
সত্যি যাওয়া যায়!

মাহী ফ্লোরা
সাধ
তুমিও চলেছ

রমা সিমলাই
অন্যমুখ

ইকতিজা আহসান
নদী

রাহুল সিনহা
বসন্ত
ডায়েরি ১

নাছরিন অপি
বিত্ত ও বৈভব

সাদাত সায়েম
স্মৃতির চৌকাঠ
রোদের বৃষ্টিতে স্নান

কপোতাক্ষী নূপুরমা সিঞ্চি
আতর চন্দন
মায়ার মিঠাপুকুর

সুজালো যশ
উল্টো রথের মায়া
দৃশ্য-অদৃশ্যের তলদেশে

ভাষান্তরিত কবিতা

টোয় ডেরিকট
ভাষান্তর: বদরুজ্জামান আলমগীর

অবিস্মৃত
লড়ে যাওয়া
পেটারসন প্রপাতে ছেলেটি
ব্ল্যাকবটম
কেন আমি জর্জ ফ্লয়েড সম্পর্কে কিছু লিখি না

সাফো
ভাষান্তর: অনন্ত মাহফুজ
এর কোনো প্রয়োজন নেই
এন্ড্রোমেডার প্রতি
নিজেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম
আফ্রোদিতি বন্দনা

এলিজাবেথ বিশপ
ভাষান্তর: কুমকুম বৈদ্য
একটি আর্ট
একটা গান– আমার প্রয়োজন

লেসলি মারমন সিলকো
ভাষান্তর: নিশাত শারমিন শান্তা
কবিতার আকাশ

হূবনাথ পান্ডে
ভাষান্তর: স্বপন নাগ
বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবী
ভয়
হিংস্রমেবজয়তে

অনুবাদ সাক্ষাৎকার

কবি আন্তোনেলা আনেডার
সাক্ষাৎকার
অনুবাদ: লুনা রাহনুমা

চিত্রকর্ম

আমান উল্লাহ
হিরন্ময় চন্দ
মোস্তফা জামান
নিখিল চন্দ্র দাস

প্যারাবল

মনিরা রহমান
হস্তি দর্শন
বীজধান
পরিব্রাজক

রফিক জিবরান
মধুমনতুষি উৎসব
ভাঙাচাঁদ ঘরামীর পথের মোড়
মাটিরকুমার
চণ্ডালকুমারী আকাহি হিয়ার সাধনা

প্রবন্ধ

মাজহার জীবন
প্যারাবল– বিন্দুর ভেতর সিন্ধু দর্শন

গল্প

মিজানুর রহমান নাসিম
যুদ্ধদিনে

শিবলী জামান
একজন যুবকের মনস্তাত্ত্বিক দুর্ঘটনা

অনুবাদ গল্প

চিমামান্ডা নগোজি আদিচে
অনুবাদ: দিলশাদ চৌধুরী
তোমার গলায় পেঁচিয়ে থাকা জিনিসটা

গ্রন্থসমালোচনা

রুখসানা কাজল
হাসিকান্না স্টোর: গতানুগতিকতার ছকে
অন্যরকম প্রত্যয়

কবিতা

সরকার মাসুদ

অন্ধকারে

অন্ধকার বারান্দায় দীর্ঘসময় বসে থাকি কেন?
নিজের ভেতর ডুব দেবো বলে
তেলাপোকারা গভীর অন্ধকারে বেরিয়ে আসে কেন?
তারা ভালোবাসে আঁধারভ্রমণ
তারা শূড় দিয়ে চাখে আঁধারের স্বাদ।

দিন ছিল ম্যাদামারা
রাতেও আকাশ ভালো হলো না আজ
ওয়েদার কক অন্ধকারে কোন দিকে
মুখ করে দাঁড়াবে আমি জানি
আরও জানি অন্ধকারে নিজের ভেতর
ডুবে যেতে যেতে শোনা যায় বিলুপ্ত
পাখিদের গান।

সরকার মাসুদ

শীতের রচনা

আজ কুয়াশার চোখ ফুটেছে
আজ সকালে নির্বিষ রোদ
এখন জলতরঙ্গে বেজে উঠছে বিভোর সরোদ
আজ লজ্জাতুর ভালোবাসা
খুঁজে পেয়েছে ভাষা
শস্পার ঠোঁটে–

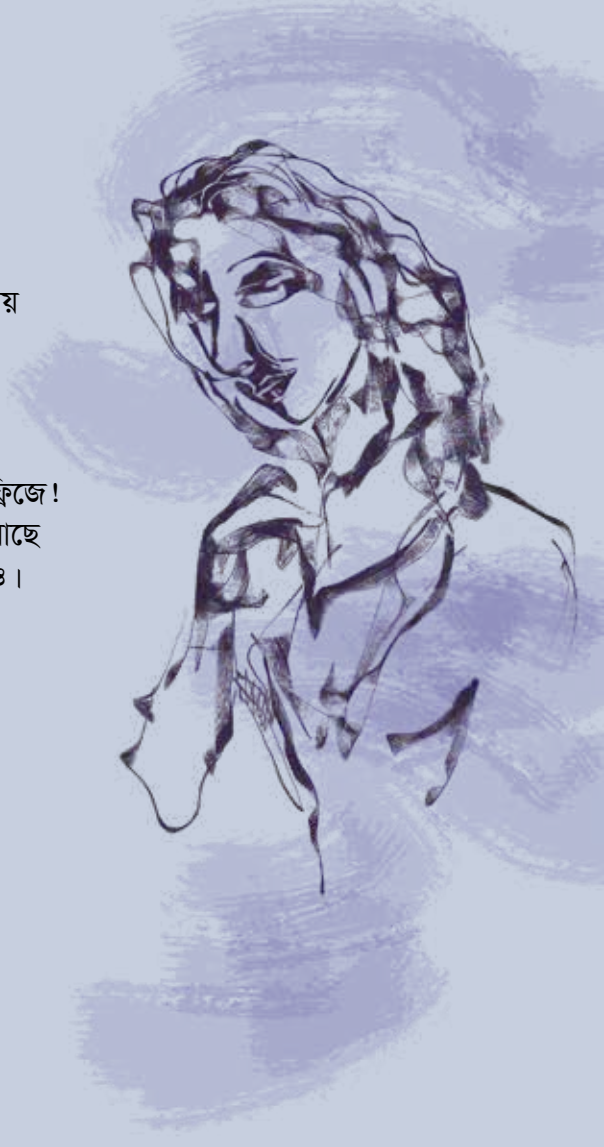

বিষাদে ম্লান প্রেমিকের চোখের তারায়
তীর ও ফুল আঁকা গোলাপি রুমাল–
আবেগের জংগলে ভালোবাসার কথারা হারায়
ঘুড়ি উড়ে দূরে পড়ে যায় কাটাখালি ব্রিজে।

আজ সকালে গোলাপি আলো
ভ্রমণের স্মৃতি যত্ন করে রেখেছি ব্যক্তিগত ফ্রিজে!
এখন ঘাসের পাতায় প্রেমের শিশির পড়ে আছে
কুয়াশা কেটে গেলে তাকে পাবে না কোথাও।

সরকার মাসুদ

আমি ভাবি

খোলা জানালার ভেতর দিয়ে দেখি
মাঠে কাজ করছে লোকজন
আমি ভাবি মানুষ কাজের ভেতর অনুভব করে
নিজের জীবন
ভাবি মেঘলা অবসর কিভাবে গোপনে
কর্মস্পৃহা আনে বেকারের মনে–
আর ঠিক তখনই হাফ প্যান্টপরা ছেলে
দিগন্তরেখা ধরে দৌড়ে যায়
সাইকেলটায়ারের সাথে সাথে
খোলা জানালার ভেতর দিয়ে আমি দেখি
জলমগ্ন ধানখেত–
ওইপাশে ছোট্ট বনভূমির বিছানা
তাতে গড়াগড়ি খায় ঝরা পাতা,
মূমূর্ষ পাখির আর্তনাদ!

সরকার মাসুদ

রাত শেষে ভোর আর হবে না কোনোদিন

বাদুড় উড়ছে কলাবাগানের দিকে
তক্ষকের কাঠখোট্টা ডাক শুনতে পাচ্ছি আমি
গাছের চামড়া চুইয়ে নামছে কালো রক্ত–
এই গোলার্ধের চির অভিশাপ।
বিশাল একটা ড্রাম থেকে কেউ ঢেলে দিয়েছে
রাত্রিপ্লাবি আলকাতরা
এক আগন্তুক কালো বিড়ালের দুই চোখে
জ্বলছে দুটি হীরা

রাত শেষে ভোর আর হবে না কোনোদিন!

সরকার মাসুদ

কেন

কালভার্টের নিচে মাতালের অসংলগ্ন
আলাপের মতো কৌতুকপ্রদ জলশব্দ
আমি তার কাছাকাছি বসে নাচের শব্দ শুনি
পৃথিবীর চিরপ্রিয়তমার দুরন্ত হাসির সুবাস পাই

এমন ঝিরিঝিরি হাওয়া-জল ভাববিহ্বল সুসময়ে
কেন মাথায় ঢুকে পড়ে এই ছবি
বড় রাস্তার ওপর চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে আছে
স্থিরচোখ, খুব শাদা একটা নিঃশব্দ খরগোশ!

বেনজামিন রিয়াজী

স্তিমিত সূর্যের সাথে

স্তিমিত সূর্যের সাথে
মেঘে মেঘে গাঢ় লাল নামে।
নিস্তেজিত যোদ্ধার শরীর।
প্রান্তরে বিলয়যজ্ঞে এখন বিরতি --
সুদূরে মিলিয়ে গেছে সাঁঝের আরতি
কাঁসরের ধ্বনি, ঢাক,
বুকের দামামা প্রায় নিস্পন্দ,
ক্রমশঃ প্রস্তরীভূত রক্তলাভা
ধীরে ধীরে ঘনীভূত হয়
শীতল শিরায়।
জমে গেছে ঝরে পড়া রক্ত আরো আগে,
চাপ চাপ রক্তের ভেতর শুয়ে থাকা
কণ্ঠ থেকে নিভে গেছে স্বর,
দৃষ্টি ঘিরে নেমে আসে
গাঢ় শাদা কুয়াশা-চাদর।

চোখে কোন কথা নেই,
যন্ত্রণার মতোই নিথর
বিচূর্ণ বল্লম
পড়ে আছে পাশে,
দূরের আকাশে
রণিত ওঙ্কারধ্বনি, অশ্বদের হ্রেষা
জাগাতে পারেনা কোন থর
ঘুমে পাওয়া অবশ স্নায়ুতে।
অর্থহীন তার কাছে
আগামীর রথের ঘর্ঘর
অগ্নি বায়ু
অর্থহীন জল
জী-হোনের স্রোতের কল্লোল
পী-শোনের ঢেউ
জাগাতে পারেনা তাকে কেউ--
পাখির প্রভাতরাঙা গান
যুদ্ধের কামান, তপ্ত গোলা,
ফুলের বাতাস ভাঙ্গা দোলা,

মায়ার বিফল কান্না,
মিছিলের কোন আহাজার।
চোখের পাতায় যেন
ভারী সীসা নেমেছে পাথার।

যোদ্ধাদের বারুদ চেতনা
ক্রমশই নিভে আসে,
গড়িয়ে জমাট বাঁধা রক্ত ঘিরে
মাছির ভন্ ভন্
মৃত বর্মে তোলে না কম্পন;
মুণ্ডুহীন শিরস্ত্রাণ
স্বপ্নহীন খুলি
ধূলিযুদ্ধ ধূলি আর ধূলি।

শূন্য তূণ
ছিঁড়ে যাওয়া ছিলা
বক্র কুঁজো ধনুক একেলা
পড়ে আছে পাশে,
তীরের বিষাক্ত ফলা
গেঁথে আছে ঘাসে সারি সারি
গেঁথে আছে বুকে পিঠে মাংসের গভীরে--
সেই বিষ ধমনীকে ঘিরে
নীলারণ্য কাঁটাগাছ
বিষদাঁত শাণিত বিস্তৃতি,
মেলে ধরা ফণা
সূর্য আড়াল করা
আঁধার অজানা
ঢেকে দেবে দ্রোহের সকল ইতিহাস।
চারদিকে সারি সারি লাশ আর লাশ।

অনীত রায়

শিরোনামহীন ১

তোমার হৃদয় খুঁড়েছে আমার দেউল মদিরা
তোমার বাসিত মাটিতে পিয়েছে গোলাপ সুবাস
তোমার কাঞ্চনজঙ্ঘার সুবর্ণ পেয়েছ আমাতে
গর্বিত আগুন শিখরে সলাজ মৌন চন্দ্রমৌলি

অসীম নির্লিপ্তিস্নানেই লালন পেয়েছে জাতক
গভীর নৈকট্যে বিছাও দুচোখে চেতন-বিছানা
পরম নিশ্চিন্তে তোমার সাধনে সে হয় রাজন
নিবিদ তৃপ্তিতে কুটাম কাটাম নিথর যমুনা

বিষাদ-আকাশে প্রশান্তি, ভাস্বতী মনন আঁধারে

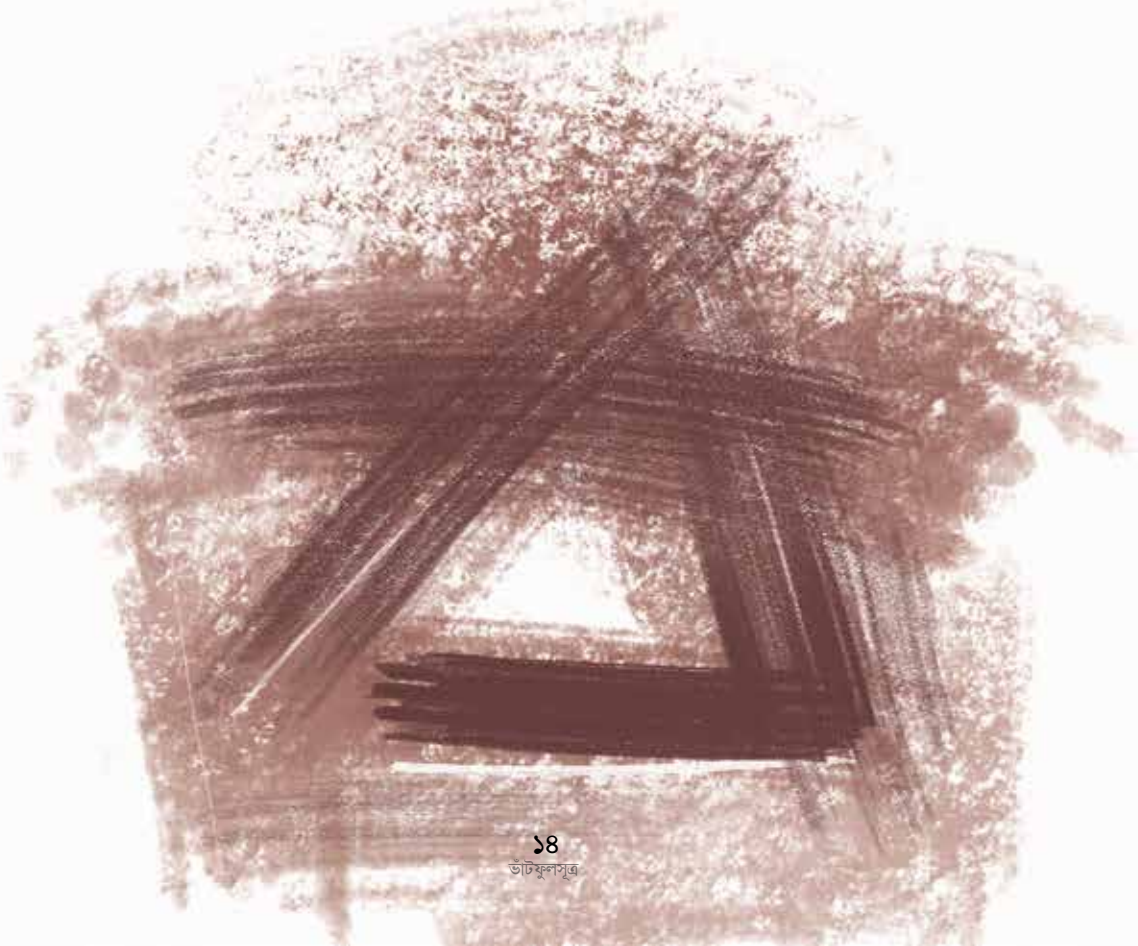

অনীত রায়

শিরোনামহীন ২

জানি তুমি তাকাবে না পিছন ফিরেও
বেহেস্তের পথে তুমি দ্বিধাহীন যাবে
একটি পায়ের ছাপ মাড়াবে না ছায়া
প্রাক-ইতিহাস-স্কেলে সময় বিচার
প্রত্নসংশ্লেষে গড়ো প্রায়-ইতিহাস
হিরণলিহ স্তোত্রলিপি সমাজ-দর্শনে
কল্পসত্য চাঁদখামে পচা মোগলাই
তাজচূড় কাঁদে গিয়ে দাদীর কবরে

ঋতপথে দৃঢ় জানি, কুষ্টিয়ার পথে
বনবাণী রং নেই, বেচারা রাখাল
সাঁইভেলা পাটাতনে রেখেছে দুটি পা
অপেক্ষার তীব্রদাহে কণ্ঠাগতপ্রাণ
তুমি বড়ো বেঅকুফ, তোমার কফিনে
গোলাপের দল মুড়ে শয্যা পাতে বেণী

অনীত রায়

শিরোনামহীন ৩

সারাটা জীবন কান্না লুকিয়েছ তুমি
তোমার দুচোখে নীড় বেঁধে থেকে গ্যাছে নদী ও সমুদ্র
মুখটাকে করেছ পাথর
পাথরের কোন বোধ থাকে নাকি?
কিছুতেই কিছু আসে বা যায় না
বজ্র আঘাতেও কাঁপে না চোখের পাতা
লক্ষ অনুরাগে লালিমা রাঙে না গালে
শুধু তোমার শৈশব
ছায়া ফ্যালে যদি মানুষের মুখে
তোমার শরীরে দোল খায় নদী ও সমুদ্র
কেঁদে ওঠে হিমালয়চূড়া
চন্দনবনেতে ওঠে অনুভব-ঢেউ
তোমার পাথর মুখে কোন্ রসায়ন ঘটে?
উইংসের আড়ালেই কেন চুপে রেখে দাও তোমার জারণ
হে মসিয়ে ভেরদ্যু
আরেকটু খুলে দাও বুকের কপাট
ছুঁয়ে দেখি,
রাত্তিরের কান্না কতখানি জমে থাকে পাথরের বুকে

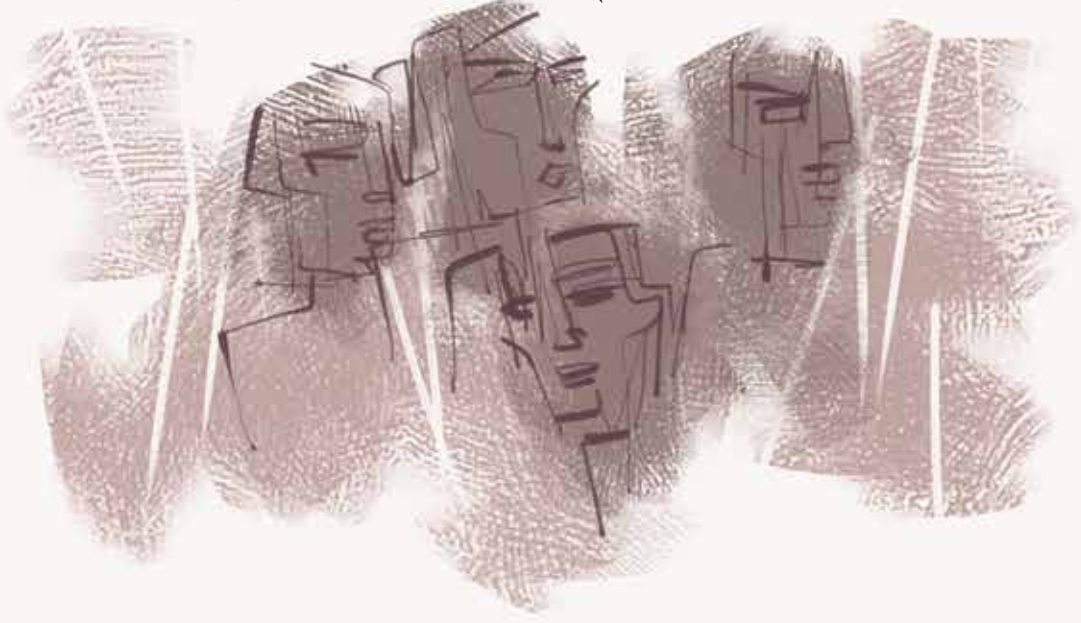

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

বসন্তদিন

ওই যে যাদের হিংস্রতায় সবুজ বনে আগুন লাগে
প্রবল ঘৃণা যাচ্ছে ছুটে তাদের পানে আগুনফাগে।
জীবন পোড়ে শুকোয় সবুজ ওড়ায় বাতাস বন্যতুলো
প্রবল তাপে জলের উড়ান কোথায় হারায় স্বপ্নগুলো!

একটি দুটি শুকনো পাতা আড়াল খোঁজে মাটির ফাঁকে
জীবন্মৃত গাছের ডালে জাদুফুল আর কোকিল ডাকে।
ভাঙা বাটির দুঃখ হাতে করুণ চোখের মলিন শিশু
খাবার খোঁজে বদল কোথায় ওরা কি সব নতুন যিশু?

কেমন করে আনন্দগান বাজাবে আজ মোহনবীণা
স্বপ্ন দিয়ে ভুবন সাজাই হঠাৎ আগুন নাই ঠিকানা?!

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

ফুল

আঙুল ঢেকেছে মুখ
হাতের কৌশল
মুখোশ সরিয়ে নিয়ো ঘুম
ঘ্রাণকোশ রস চেনে প্রলয়সংকেত
পিঁপড়ের নার্ভে ফেরোমোন জাগাও সকাল
রং লাগুক ঘ্রাণে পুলক পরাগ।

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

গাছ

প্রতিদিন কথা বলি

কংক্রিট ক্ষত মাড়িয়ে যাই
বাধে তবু.....

তুমি কিছু অনাত্মীয় নও
যোজকবন্ধু জড়িয়ে রেখেছো

সব বোঝো আশা ও বেদনা
কান্নার ভাগ গান গাওয়া-গায়ি
খচ্চর দৌড় অথবা রাসভ

সব চেনো।

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

তোমাদের কথা

এখনো রয়েছো বুঝি কালজানি ঘুমে
পাতার কিরণলাগা পোশাকে ও সাজে
বর্ষার ঘাসফুলে আনমনে হাত
ভাদুরে আদর মাখা খেয়ালি বিবাদ
সেই মুখে তির্যক সূর্যের লাল
প্রাণের পাথরে পা সেই যে চলা
মনে হতো অবিরাম তেমন চলুক

এখনো বর্ষা এলে কালজানি ডাকে
হাবুডুবু ভেসে যাই সবুজপুলকে
রমন্যাস পাতা খুলে কত ভাঙাগড়া
মনে আছে কালজানি তোমাদের কথা

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

ঝড়

প্রবল আসছে ঝড় ঘরে দাও খিল
শনশন হাওয়া বয় মেঘের মিছিল।
এ মেঘ আকাশে নয় ঘরে ঘরে মনে
চেনারা অচেনা হয় প্রবল ভাঙনে।
শুভবোধ শেষ হলে ধ্বংসের পাশা
গিলে নেয় ফুল পাখি শিশুমুখ আশা।
বিশ্বাস হাওয়া হলে মানবতা ফিকে
কান্নার রোল ওঠে দিক থেকে দিকে।
রাক্ষস ছিঁড়ে খায় মানুষের দেহ
ঝরে যায় যত ফুল ভালোবাসা স্নেহ।

রওশন রুবী

ঘোষ বাড়ির ময়না

আমি ওকে ঘোষ বাড়ির গোবেচারা ছেলে বলে জানতাম।
তার একটা ময়না ছিল। যে আমাকে নোয়া বলে ডাকতো।
এ নাম সে কোথা থেকে পেয়েছে, কে জানে।
হয়ত সে কোনদিন পাহাড়ে ছিল, বন-বনানীতে ছায়া ফেলে
উড়তো নোয়ার সাথে, তারপর হারিয়ে ফেলেছে তাকে।

আচ্ছা পাখিদের কি প্রেমিক প্রেমিকা থাকে?
নাকি সবটাই যা দেখি তার বিপরীত?
যদি নাই বা থাকে তবে নোয়া কার নাম?
মা-বোন কোন বনটিয়া, মৌটুসি অথবা কোন হরিণীর নাম?
যার মুখ কাশ্মীরি, গালে গভীর টোল, কুচকুচে সরল চুল?
যে হাসলে ঘোষদের ছেলের মতো অগণন মরু শীতল হয়ে যায়।

কতবার ভেবেছি বলব- আমার নাম বেনু।
গিয়েছি; খাঁচায় ময়নাটি ছিল, তাকে পাই নি।
ছেলেটি দুপুর কোলে একদিন লিখে দিল-
মনে থাকবে আপনার নাম, নামের বানান।

সেই থেকে নোয়া নামটা আমার স্থায়ী স্বীকৃতি পেল।
বুঝলাম- ঘোষ বাড়ির ময়নাকেও আমি হৃদয়ে রাখি।

সুস্মিতা চক্রবর্তী

সত্যি যাওয়া যায়!

সত্যি যাওয়া যায় যেইখানে যেতে চাই আমি!
যেখানে রোদের সাথে ছায়াদের বিরোধিতা নাই
যেখানে জলের ঘাটে আকাশের আকুল চাহনী
যে পথে থমকে থাকে অখণ্ড মুহূর্তটাই!

সে পথ আগলে বুকে মন চলো মেরাজেই যাই
যেখানে আল্লানবী একাকার মায়াময় পথে
ওহীর মতোন কোনো নামজপ দেহের সমীপে
কাবায় কাঁপিয়ে ঝরে মরুঝড় অদ্বৈত রথে!

সত্যি যাওয়া যায় যেইখানে যেতে চাই আমি!
যেখানে বাতাস এক স্বস্তির মত শুধু বাড়ে
যেখানে তোমার চুল আদরের মুঠো জুড়ে থামে
অচেনা প্রজ্ঞা পথে অচলিত প্রেম হাত নাড়ে!

পৃথিবী এখনও বাঁচে প্রেমে আর দ্রোহে দোঁহে মিলে
আর সব পরিত্যক্ত মানুষের উগলানো বিষে
মুনযির-মন চলো সেই সে চিরহরিৎ বনে
বার বার মরে যাই বেঁচে উঠি ফের ভালোবেসে!

মাহী ফ্লোরা

সাধ

কেন কোন সাধ নেই, বাঁচবার কেন নেই কাঙ্খা আমার,
কেন ইতিহাস হয়ে যাই ইচ্ছের কাছে,
কেন মনে হয় সব থেমে গেছে,
এ দুপুরকে মনে হয় নিশুতি রাত!
কেন তুমি নেই, কেন নেই তুমি,
কেন এই জ্বর তপ্ত কপালে
তুমি পাঠালেনা শুভেচ্ছা কার্ডে ভরে কোমল স্পন্দন,
কেন এলোনা ভেসে ভেসে হাওয়ায় স্পর্শীয় হাত?

মাহী ফ্লোরা

তুমিও চলেছ

সমুদ্র তোমাকে ডেকেছে লোকালয় হীন জলপ্রান্তরে।
জলের ভেতরে তুমি বীজ বুনে দাও টিয়ামন ধান।
মাঠ ঘাট আর বৃষ্টিকে ভালবেসে তুমিও চলেছো এক লালগাড়ি চড়ে।
বাদামের বন থেকে কিছু সাধ পাতা ছিঁড়ে নিও রাগে।
সমুদ্র পাড়ি দেবে পাতার নৌকায়,
তোমাকে ডেকেছে জল এসবেরও আগে!

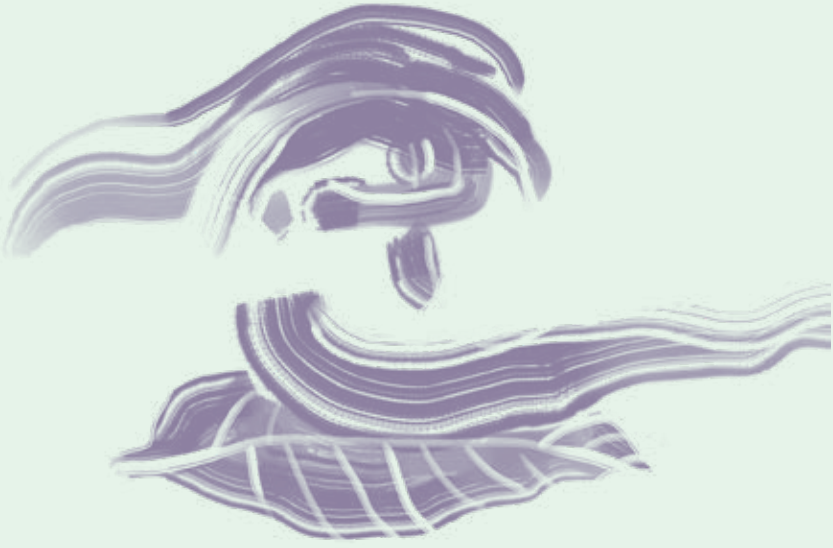

রমা সিমলাই

অন্যমুখ

নীল,
এই প্রথমবার আমি ধরা পড়ে গেলাম। – আমি কবি নই! জানুতে – জঙ্ঘায় – বিভাজিকায়, পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় রাহুগ্রস্ত অক্ষরেরা পুলিশে তাড়া করা আসামীর মতো আমাকে এড়িয়ে চলে...

মহাকাব্য উর্মিলাকে বিজয়ীর আসন দেয় নি কখনও, অথচ জনকনন্দিনীর মতো সেও পতিব্রতা, বিরহিণী, – ভেবে দ্যাখ, স্বামীসোহাগের বঞ্চনায় থৈথৈ নীল মেয়েটি শাশুড়িসেবায় কাটিয়ে দিয়েছে চোদ্দ চোদ্দ বছর!

লিলিথ পুরুষের উল্টোপুরাণ অস্বীকার করেছিল। তৃতীয় পাণ্ডব– সৃষ্টির প্রথম জিগালো, উদাসীন পায়ে হেঁটে গ্যাছেন কুরুক্ষেত্রের অনাবাদী জমিতে,– তবুও অক্ষরেরা অর্চনা করে গ্যাছে "সীতামাইয়া" আর "কৃষ্ণ কানহাইয়া" র। সময়ের জতুগৃহে ছারখার হয়ে গ্যাছে অজ্ঞাত বনচারীর পঞ্চপুত্র। অক্ষর জড়ো করেছে শকুনি আর দুর্যোধনের নির্বোধ উল্লাস!

নীল, তোর বুকপকেটেই প্রতিদিন বিদায়ী সূর্যকে জমা রেখে, আমি বাড়ি ফেরার ট্রেন ধরতাম। নিশ্চিন্ত ভাত রুটি আর বিছানায়, অক্ষরেরা কখনো দিকভুল করতো না। দ্বন্দ্ব ছিল না সন্ধি-সমাসে!

জীবন আমাদের কি এমন সওদাগরী শেখালো বল তো, এখন আমরা সবাই এক একজন চাঁদ সদাগর হয়ে গেলাম হেতালের বনে.....
আমাদের ভবিতব্য হয়ে চ্যাংমুড়ী কানী!

নির্দায় অক্ষরেরা থুতু ছিটিয়ে বলে গেলো, "কবি নও, কবি নও। তুমি শুধু ভাণ"!

নীল, শেষবার সাগরসঙ্গমে যাবি আমার সাথে
পুরো সমুদ্রটা তোকে দিয়ে দেবো, কাড়াকাড়ি করবো না একটুও। বিশ্বাস কর!

অক্ষরেরা নিঃস্ব করেছে অনায়াসে। আমার কি আর কাড়াকাড়ি করা মানায়!!!

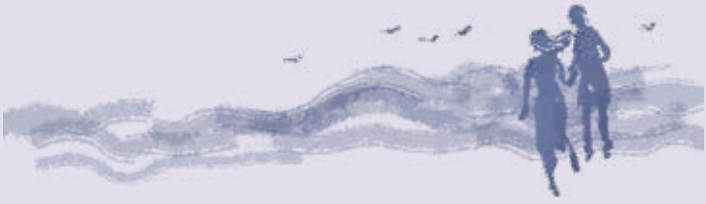

ইকতিজা আহসান

নদী

আমরা কয়েক বন্ধু শৈশবের স্মৃতি ফিরে পেতে নদীর কিনারে যাই
নদীর মধ্যে ধানক্ষেত, বীজতলা, সাদাকাশ
আঁকাবাঁকা খাবলা খাবলা কিছু পানি
দূরে খালের ক্ষীণ রেখা
শুধু স্রোত নাই
ভরদুপুরে চিক চিক বালুর চর
আমরা একে নদী বলে ডাকি...
আমাদের স্মৃতিতে বহুদিন জায়গাটি নদী

নদীর মধ্যে নেমে আমরা নদীকে খুঁজে বেড়াই
আমাদের কানে উপচানো জলের কুল কুল শব্দ
চোখে এককোষা নৌকার বিহ্বলতা
শৈশবের নদীর পুরনো সকল দৃশ্যাবলী
আমরা চরের মধ্যে সাঁতারের অঙ্গভঙ্গি করি
পুরনো স্রোতের ঘূর্ণিপাক আমাদের টেনে ধরে
আমরা তবু থামিনা
একেকটা বিস্তৃত চরের মধ্যে আমরা
মরে যাওয়া একটা নদীকে খুঁজতে থাকি

রাহুল সিনহা

বসন্ত

কোথা সে মোহনবাঁশি, কোথায় যমুনা নীল জল
ব্রজের ধূসর পথে পানিয়া ভরনে যাওয়া ছল,
এসেছে আবার হোরি, ফাগুয়ার আবিরে গুলাল,
হেথায় শ্রীমতী আর মথুরায় যশোদাদুলাল।
এই পথে আবার কি দেখা হবে মধুরজনীতে?
ফিরবে কি শ্যামরায় রাধিকার সংবাদ নিতে?
আর তো হলো না দেখা, দুজনেই একা এ জগতে,
দূরত্ব অনেক আজ, প্রলেপ কে দেয় কার ক্ষতে?

রাহুল সিনহা

ডায়েরি ১

এত একা কেন লাগে? এত বিষাদ
কেন জড়িয়ে থাকে সারা শরীরে?
আমি রোজ কাজে ডুবে যেতে চাই,
রোজ রাতে নিজেকে বলি, মেনে নাও,
এই তোমার নিয়তি ও ভবিতব্য,
তোমার কখনও কেউ ছিল না,
তোমার নিজের ক্রস একা তোমাকেই বইতে হবে।
প্রতিদিনের এই পাপক্ষয়, যাকে জীবন বলে মেনেই নিয়েছি,
সিডেটিভ স্বপ্নে কেন তুমি রোজ
আমায় জড়িয়ে ধরো, আর তৃষ্ণার্ত ঠোঁটে এঁকে দাও,
না পাওয়া চুমুর তীব্র আশ্লেষ?

নাছরিন অপি

বিত্ত ও বৈভব

একদিন আমার কিছুই ছিলো না।
তবু রাস্তা থেকে একদল ঘরপোড়া মানুষকে কুড়িয়ে নিয়েছিলাম; সস্নেহে বলেছিলাম, 'আয়। পাশে বোস। আমার এই ভাতের থালা থেকে কিছু ভাগাভাগি করে নে।'
তারা তাদের নির্মল হাতগুলি পেতেছিলো।
প্রত্যেক হাতে দু'এক লোকমার বেশী পড়েনি, তবু তারা সন্তুষ্ট ছিলো।
আমি বলেছিলাম, 'এইটুকুই সব। তোরা মুখ তোল, হাসিমুখে তাকা একবার।'
তারা কেউ মুখ তোলেনি।
তাদের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়ে ছিলো।
আমি জানতাম, তাদের চোখ তখন জলে চিকচিক করছে; দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আছে ভালোবাসায়।
আমি কোনো প্রশ্ন করিনি।
কারণ, তখন আমার কিছুই ছিলো না।

এখন আমার অনেক আছে।
বহুদূর পাড়ি দিয়ে এসে এই ফলবান সময়ে দুই হাতে বিত্তের অদৃশ্য থালা সামলাতে সামলাতে আমি একলা রাস্তায় হাঁটি।
আমার দৃষ্টি ঝাপসা।
বিলাস ও বিত্তের ভারে আমি হারিয়ে ফেলেছি সেই তুমুল বৈভব– জল চিকচিকে কিছু দৃষ্টি;
ভালোবাসায় বিনম্র সেইসব আশ্চর্য চোখ।

সাদাত সায়েম

স্মৃতির চৌকাঠ

পুকুর বুজে গেছে কবে!
তবু বাস থামলে হেল্পার হাঁক দিয়ে বলে:
পুকুরপাড়! পুকুরপাড়!

যুদ্ধ থেমে গেছে কবে!
তবু থুত্থুড়ে লোকটা কথা বললে মনে হয়
যুদ্ধের দামামা বাজে

নদী মুছে গেছে কবে!
তবু পাখিদের চোখে
গলুইয়ের স্বপ্ন জেগে থাকে

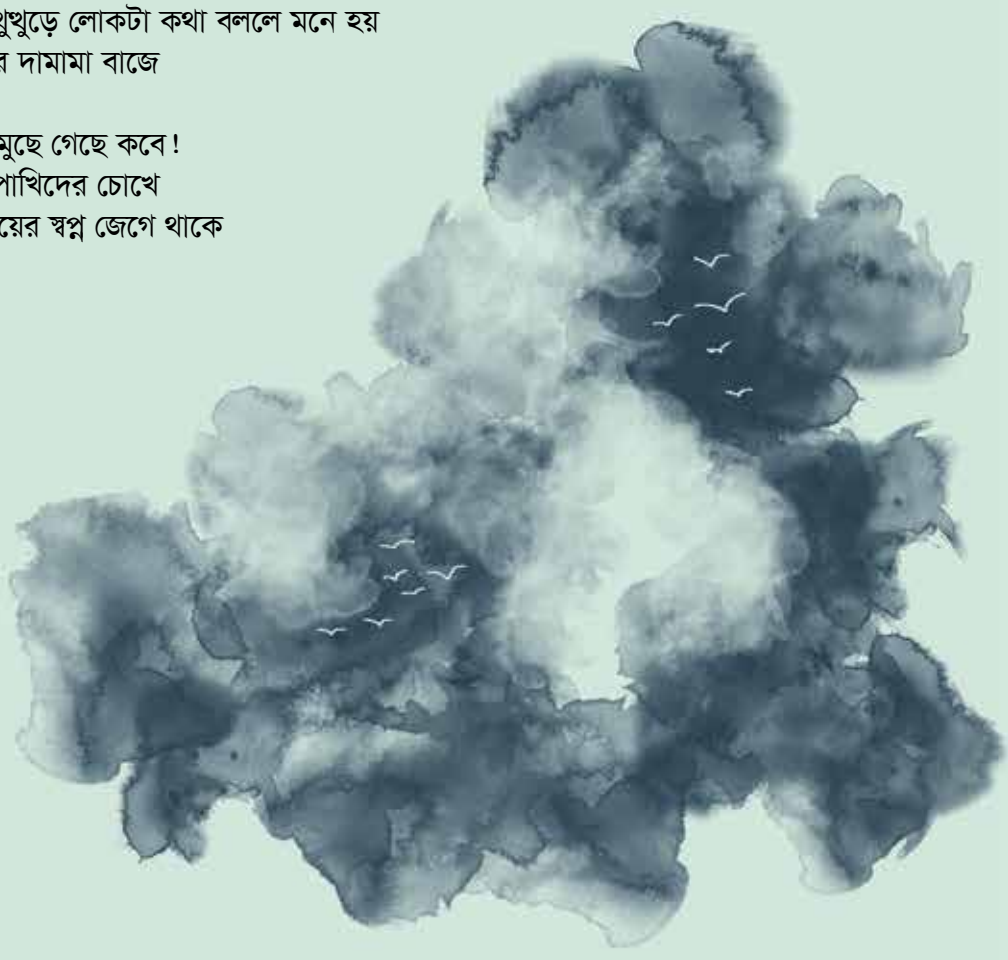

সাদাত সায়েম

রোদের বৃষ্টিতে স্নান

সেদিন একটা প্রজাপতি লিফ্‌ট থেকে সোজা বেরিয়ে এলে আমার চোখের সামনে এক ভোজবাজি ঘটে গেল। ইয়া মস্ত দালান, সুউচ্চ খিলান মুহূর্তে নাই হয়ে গেল। বৃষ্টি আর বৃষ্টি; আমার চোখের রেটিনা জুড়ে ফোটন কণার বৃষ্টি নামল। রোদের বৃষ্টিতে স্নাত আমি দেখি: বসে আছি স্মৃতিগন্ধা চা-স্টলে; থুতনিতে হাত রেখে ভাবছি: প্রজাপতি ফ্রক ছেড়ে শাড়ী ধরল কবে!

কপোতাক্ষী নূপুরমা সিঞ্চি

আতর চন্দন

নহর জলের বুক চিরে এগিয়েছে তোমার লাশ
সে জলের বুকে গাঙ্গচিল হয়ে উড়ে বেড়াই আমি
খুঁজে বেড়াই তোমার ফেলে যাওয়া ঘ্রাণ।
শূন্য আতরের শিশি জলে ভাসে ডুবে
আমি তোমায় পাই চন্দন মাখা আতরের সুবাসে।
এত নির্মল দেখিনি আগে কখনো
মেঘের সাদা কাফন জড়ানো মুখের চারপাশ
সেদিন জেনেছি কাফনের চেয়ে সুন্দর সজ্জা আর কোথায়?
কালো মেঘ সুরমায় সেজেছে চোখ
মর্মভেদে চিরঞ্জীব হয়ে রয় ঘুমন্ত মায়া মুখ।
কাঁচা হলুদ রোদে জ্বলজ্বল করা মুখখানি
আমার কাঁপা কাঁপা আঁখি পল্লবে রেখে যায় চান্দের জ্যোতি।

কপোতাক্ষী নূপুরমা সিঞ্চি

মায়ার মিঠাপুকুর

কৌড়াল পক্ষী আমার বুকে ডাকে করুণ সুরে
তার ডাকে আমার চোক্ষে জল নামে কেন?
এত মায়ার জন্ম কোন আতুরঘরে
রক্তে লেপা ঘরখানি চোক্ষে ঝলমল করে
আমি দম আটকে কাঁপি মায়ার মিঠাপুকুর তলে
আমার চোক্ষে নুন খেলে লুকোচুরি
নোনতা ব্যথা ওড়ার ছলে
সময়ে জমা মায়ার জাদু গজল হয়ে ঝরে।

সুজালো যশ

উল্টো রথের মায়া

মিথোলজির শরীর
নাকি স্রো ফুলের হৃদয়?
হাওয়া থেকে ঝরে যায়
কোথাও কিছু
অন্ধকারের ঠোঁট
এখানে দুর্ভিক্ষের বয়স গড়ালে,
মহাকালের বুক থেকে
অজস্র অস্তিত্বের পালক খসে পড়ে
শামুকের কুলাচার খুঁটে খুঁটে খেয়ে নেয়
যেন সমস্ত মায়াবী চোখ
তবুও এই সংকটে
পাশ কেটে চলেছে অজানা এক শববাহক
অথচ নেপোলিয়নের রোদ
পাহাড়ি রমণীর নিঃশ্বাস মুড়িয়ে নিতেই
ঝর্ণা বেয়ে নেমে যায় বিনির্মাণের পথ।

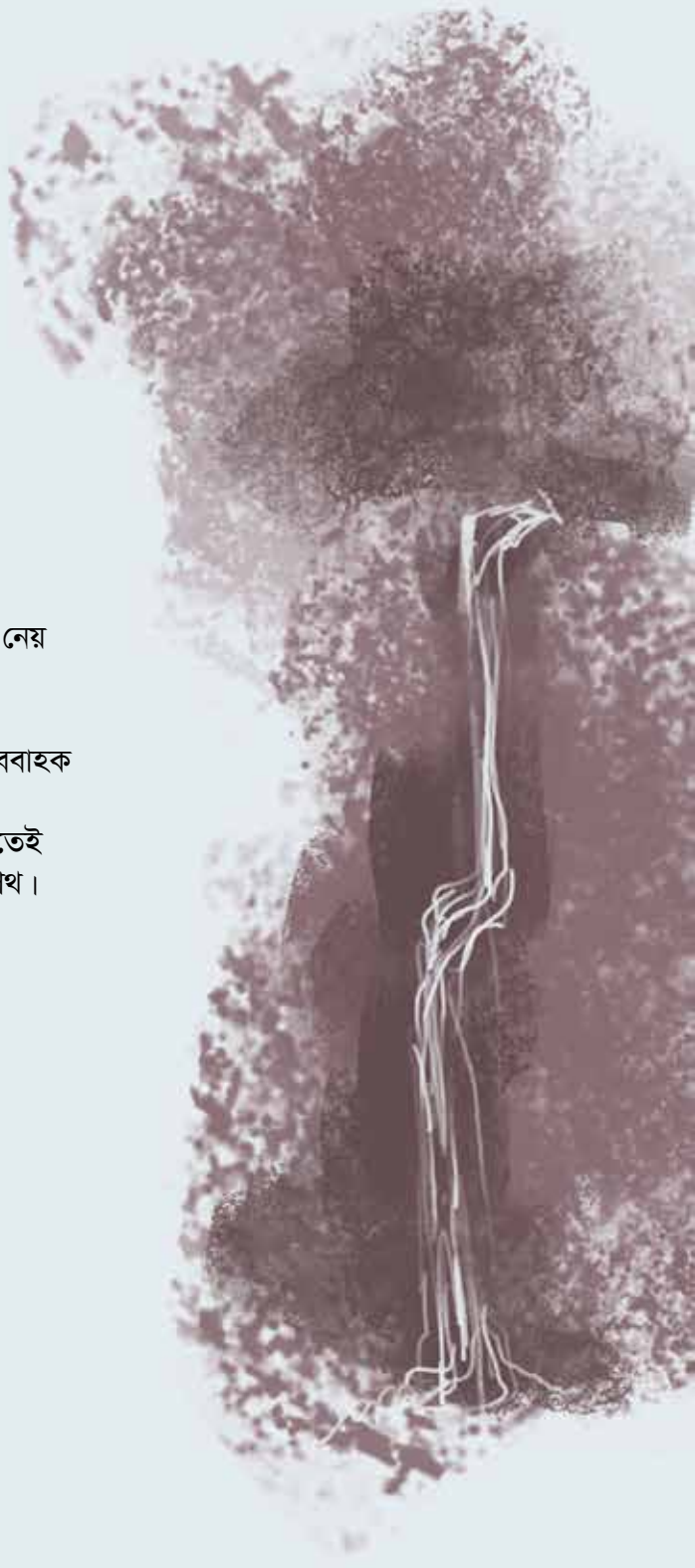

সুজালো যশ

দৃশ্য-অদৃশ্যের তলদেশে

কামোচ্ছ্বাসের বিচ্ছুরণ ছড়াতে ছড়াতে
পৃথিবী হাঁটছে
যেন ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসী এক।
ক্লান্ত হৃদয় পাখিরা নিস্তেজ
বোধির ঈশ্বর আমার ব্যস্ত
তোমার নষ্ট নীতির বন্দনায়!
ব্যভিচার আত্মার মতো তার উল্লাস পৌঁছে গেছে
নগরের সমস্ত গলিতে।

তবু আজ আমাকে বলতে হবে,
এসো সমস্ত বিভ্রান্তি ধুয়ে
পরিব্রাজক ভাবনায় ডুবে যাই
যেখানে মাকাল বনে দ্রবীভূত স্তন্যপায়ীরা ভেঙে দেয়
মূঢ়তার শ্বাসর। তলোয়ার। আর
গাঢ় মেঘ উড়ে যায় আত্মদীপের পথে ধ্যানস্থ নির্বাণ হয়ে।

চিত্রকলা

ব্যবচ্ছেদের ব্যবচ্ছেদ

মোস্তফা জামান

মানব দেহ ভেঙে ভেঙে উপস্থাপন করার বিবিধ কারণ থাকতে পারে। আধুনিকতার মানবকেন্দ্রীকতা ও সেই সূত্রে নানান প্যাথলজির বিকাশ একটি কারণ হতে পারে। নিজের ছবির বিষয়ে বলতে গিয়ে, যে মনোকাঠামো ও মানসিক অবস্থার আওতায় চিত্র বা শিল্পবস্তু জন্ম নেয়, সেই অবস্থা ও কাঠামো থেকে দূরে থেকে কিছুটা এনালিটিকাল দৃষ্টিতে দেখতে হয়। ব্যবচ্ছেদ সিরিজের কাজ মূলত দুইপ্রস্থ ধ্যান থেকে জন্ম নিয়েছে এমনটা দাবি করা যায়। প্রথমত, দেহ বা আপন সত্তা নামের যে ঘর বা আর্কিটেকচার, তার ঠিকানা যে আধুনিক সমাজে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে, তার প্রামাণ্য দলিল হিসাবে বিভাজিত দেহকাঠামো-নির্ভর এই ছবিগুলোকে এক প্রকারের সমালোচনাধর্মী সৃষ্টি হিসাবে বিবেচনা করা যায়। দ্বিতীয়ত, আত্মবিশ্লেষণের যে স্রোতে আমি ও অপরের যুগলমূর্তিকে বার বার ভেঙে দিচ্ছে, এই ছবিগুলো তার সাক্ষর ধারণ করে।

তবে, আদ্যকথার অভাবে যে গৎবাঁধা কথায় আমাদের জীবন প্রতি পদে পদে 'বাস্তব' নামের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারছে না, এমন সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে এসব ছবির আরো নানান ব্যাখ্যা হাজির করা যেতে পারে।

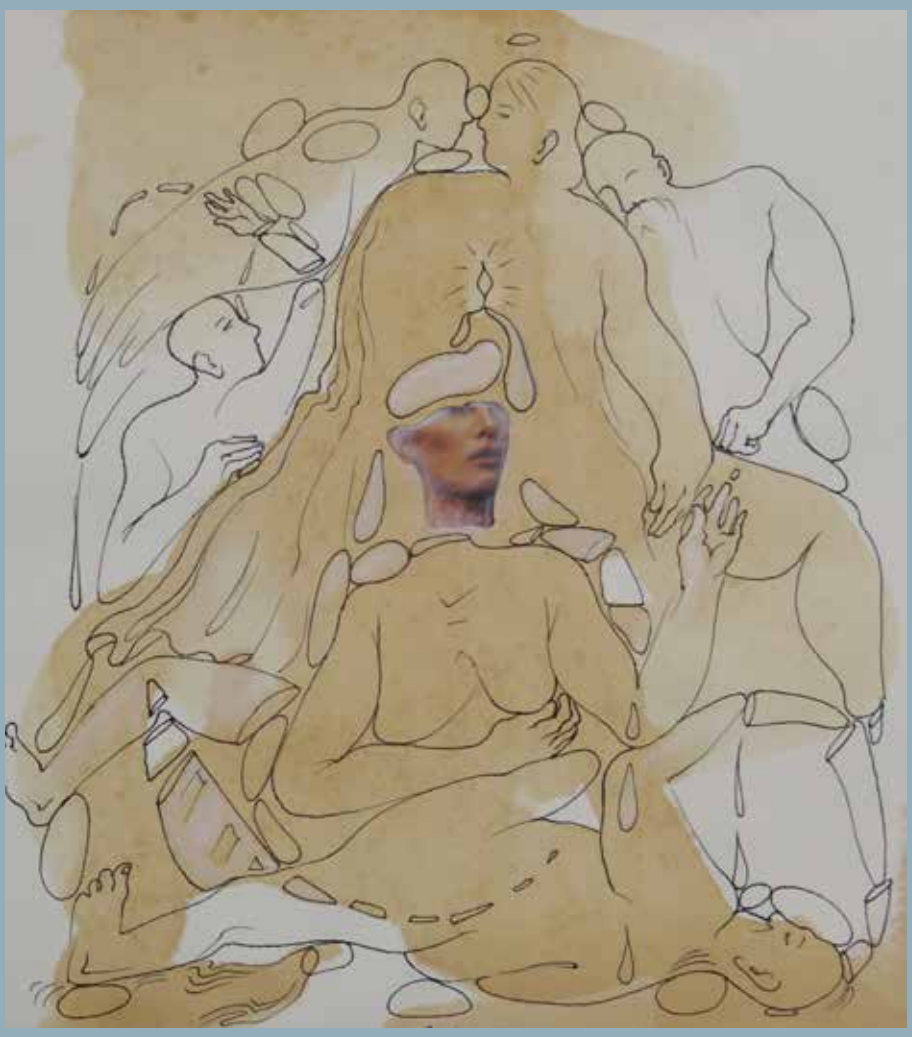

‘কোভিড স্মৃতি - দুই (মহাশ্মশান)’
আমান উল্লাহ
এক্রেলিক রং,
৫ফুট x ৪ফুট, ২০-০৫- ২০২১

‘হারানো ছবির কথা-১’
নিখিল চন্দ্র দাস
এক্রিলিক রং

‘হারানো ছবির কথা-২’
নিখিল চন্দ্র দাস
এক্রিলিক রং

‘আলোচনা ইতি’
হিরন্ময় চন্দ
এক্রিলিক রং

ভাষান্তরিত
কবিতা

অবিস্মৃত

টোয় ডেরিকট
ভাষান্তর: বদরুজ্জামান আলমগীর

আমি ভালোবাসি যেভাবে কালো পিঁপড়ারা শবদেহ বয়ে নিয়ে যায়।

তারা মৃতদের বহন করে যেভাবে লড়াইয়ের মাঠে
যোদ্ধারা শহীদ বন্ধুর লাশ পিঠে ধরে আগায়।
পিঁপড়ারা মৃতদের পিঠে অধিষ্ঠিত করতে ঘন্টার পর ঘন্টা আছাড়ি পিছাড়ি করে;
আমাদের কায়কারবার থেকে এটি একদম আলাদা। আমরা সাধারণত মৃত প্রাণি
পিঠে বহন করে আনি খাবার টেবিলে সাবাড় করার জন্য– যা কুৎসিত। কিন্তু তাদের
বেলায় মৃতের প্রতিটি অঙ্গ, কণা, অনুকণা জানাজা, অন্তেষ্টির সম্ভ্রমে নত।

আমার জিন্দেগি-সাথী তার বাবার কবরে কেমন করেছিল– মনে পড়ে।

গোরের শিয়র বরাবর বড় বড় ঘাস গজিয়ে উঠেছিল, বাবার নামটিও দেখা যাচ্ছিল
না, ঘাসে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। আমার কর্তা পকেট থেকে একটি ছোরা বের করে,
আগাছা কেটে সাফ করে ফেলে, তারপর গামছায় কবরের সিথান মোছে, বানায়
নির্ঝঞ্ঝাট।

এভাবেই বুঝি আমরাও একদিন বিস্মৃত হয়ে যাবো?

এবার সে কবরের দিকে নমিত হয়ে আসে– হুহু করে কাঁদে।

Poem: Not forgotten.

লড়ে যাওয়া

টোয় ডেরিকট
ভাষান্তর: বদরুজ্জামান আলমগীর

আমরা সাদা হতে চাইনি– চেয়েছি কী?
আমরা আদতে কী চেয়েছিলাম?

দুই কামরা থাকার ঘর– একটার পরে আরেকটা
তারমধ্যেই চারজন বয়স্ক মানুষ– দুইটা বাচ্চা।
আমার চাচা আর চাচী সূর্য ওঠার আগেই
বেরিয়ে গ্যাছে; বাবা কাজে গেল তার ফ্যাক্টরিতে
তারপর যায় ধোপার দোকান।

মা ঘর গোছায়, ইস্ত্রি সারে, রান্নাবারি করে
যুদ্ধের বাজারে ছাড় পাওয়া কূপন সেঁটে রাখে।
বিকালে হেঁশেলে লোহার টেবিলে স্টেনসিলে
লেখে মা, আমি হঠাৎ ঢুকে পড়ি তার স্কার্টের ভিতর।

আমরা কী চেয়েছিলাম?

এরমধ্যে আধুনিক ডৌল নকশার আসবাবপত্র
বাজারে আসে; এখন কার্পেট পুরো, ঘরে ওমছড়ানো
আগুনের চুল্লি- তার ছাউনির উপর একজন নর্তকী,
মনে হয়, সন্ত্রাসীর বেড়ের মধ্যে পড়ে নাচে।

দেগার মঞ্চচাঙানো একদল নাচের মেয়ে আছে ঘরে
ক্যানভাসে ভাঁজ করা।

আমরা যা– জোর করে তার বাইরে আসি–
কী চাই আসলে?

আমাদের হাত দরজায়, পাশে কাঁটাচামচ, এটা-সেটা,
চাবির গোছা– হাতের মুঠোয় কাগজের টাকা–

টাকার নোটগুলো ছিঁড়ি।

Poem: The Struggle.

পেটারসন প্রপাতে ছেলেটি

টোয় ডেরিকট

ভাষান্তরঃ বদরুজ্জামান আলমগীর

আমি ওই ছেলেটার কথা ভাবছি– যে বড়াই করে একদিনের কথা বলে– সে একটি কুকুরকে ছুঁড়ে মারে, আর কুকুরটা শেষ কণা শক্তিতে বেঁচেবর্তে থাকতে জীবনপাত করে।

আমার চোখে ভাসতে থাকে একটি মৃত প্রাণী কেমন পাথরের উপর পড়ে থাকে। আর এ-কথাটি ভাবি, এমনও তো হতে পারতো– এই অসহায় জিনিসটির জন্য ছেলেটি অনাথ বন্ধুর আকুলতায় সাহায্য করার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে– ওর তো মেলা উদ্যম আর শক্তি।

এ নিশ্চয়ই কিছু আবশ্যক জবাব দিয়ে থাকবে, আলমারির পিছন থেকে কারো নীরব গোঙানি আসার কথা, ভারী রাত্রি নামার সঙ্গেসঙ্গে বুক সুরাক করা আহাজারি ছড়িয়ে পড়ে থাকবে, এমন দৈবাৎ তৎপরতা তাকে স্বাগত জানানোর কথা– নিজেকে মনে হবে বিজয়ী– খুনখারাবির ভিতর থেকে সে একটা স্ফূরণ এনেছে।

কিছু আলোড়ন, কিছুটা ঝাঁকুনির পর পাথরের উপর থেঁৎলানো শরীর একটি নীরেট পাটে স্থির হয়েছে– ধুলা ঝাড়াই মোছাই করে একটি এবড়োখেবড়ো কার্পেট যেমন মেঝের উপর বসে।

শেষাবধি সবই উড়ে যায়– কেবল স্মৃতি জমা থাকে। সকল শোক সন্তাপ ঘাতকের কম্পিত হাতের উপর বুঝি হেঁটে যায়– কোন কিছু না পাবার আশায়, এমনিই।

Poem: Boy at the Paterson falls.

ব্ল্যাকবটম

টোয় ডেরিকট
ভাষান্তর: বদরুজ্জামান আলমগীর

আত্মীয়স্বজন আমাদের এখানে বেড়াতে এলে
তাদের ব্ল্যাকবটম দেখাতে নিয়ে যেতাম।
আস্তে গাড়ি চালানো হতো। বিউবিয়ান আর হেস্টিংস এলাকা। গিঞ্জি।

শনিবার রাতের বাইচালি। ঠাসাঠাসি। আমরা তাচ্ছিল্যভরে হাসি। সেইসাথে কেমন খানদানি খানদানিও লাগে। অলিগলি যতো বেশি সরগরম, ততো বেশি ধন্যধন্য ভাব।

মাঝারি শ্রেণির কৃষ্ণাঙ্গদের আর দেখা যাচ্ছে না–
ওরা সরে গ্যাছে।

দেখি যৌনকর্মীর শরীরে বেশ জেল্লাদার পোশাক–
আমরা রগড় করি। রাস্তার কিনারে বোতল হাতে ঝিমুচ্ছে একজন– বড় অযত্নের ডেকচির মধ্যে রান্না হচ্ছে বারবেকিউ। কড়া গন্ধ– জিভে পানি এসে গেল। বারবেকিউয়ের জন্য ভিতরে চনমন করে ওঠে, কিন্তু কিছু করার নাই।

জানলা গলিয়ে ব্লুজ-এর গমক হামলে পড়ে আমাদের উপর, তীব্র উচ্চ বাজনার লয়– গায়িকার স্বর জলদগম্ভীর; কিন্তু সম্মিলিত হুল্লোড়ের ছুটে তার ভরাট কণ্ঠ ছত্রখানে মিলিয়ে যায়।

আমি খুশি মনে শবযাত্রা দেখতে চাই। চাই সত্যি। তার ফলেই বুঝতে পারি– এটা আমি নই।

আমরা গাড়ির শার্সি নিচে নামিয়ে দিই। উৎসবের উপচানো ঢেউ রক্তের তোড়ে আমাদের ভাসিয়ে নেয়।
এটুকু আশা করি, সোমবার দিন এসব হুজ্জতি থাকবে না– অফিস, আদালত, পোস্টাফিস, ইশকুলে যেতে পারবো।

ভোগান্তি আমাদের জন্য একটা সুফল বয়ে আনবে, পিলে চমকানো বাজনার মধ্যেও স্থিরতা থাকবে, সবটুকু তছনছ হবে না– আশা করি।

আমাদের বহুদিনের জংধরা গলার আওয়াজ, নিজের পাড়া হারিয়ে ফেলেছি–
সব এখন ঝকমকে কোনাল্ট গার্ডেন। পুরনো ইট, নোনা ঘরদোর কেমন সাবেকী

ব্ল্যাকবটম
টোয় ডেরিকট
ভাষান্তর: বদরুজ্জামান আলমগীর

ঝিমধরা ছিল! মনের অজানায়, এমনিই, কারণ ছাড়া আর গান গেয়ে উঠতে পারি না এই নয়া মহল্লায়।

ফিরে এসে আমরা কচলিয়ে ওদের হাত ধুই, আস্তরণের ভিতর থেকে ওদের গন্ধটা শুঁকতে চাই– যাদের বসতি, পত্তনি আমাদের ফালাফালা করে ফেলে, তাতেই বুঝতে পারি– আমরা এখনও নিজের ছাঁচে মানুষে জমাট বাঁধি।

Poem: Blackbottom.

কেন আমি জর্জ ফ্লয়েড সম্পর্কে কিছু লিখি না

টোয় ডেরিকট
ভাষান্তর: বদরুজ্জামান আলমগীর

কারণ কোনটা রেখে কোনটা বলবো
কারণ আমার বলার কিছুই নাই

কারণ আমি জানি না কী বলতে হবে
কারণ সবই বলা হয়ে গ্যাছে

কারণ কিছু বলতে চাইলে যন্ত্রণায় ভেঙে যাই
আমি কী বলতে পারি, কী?

কিছু একটা আমার গলায় আটকে আছে
একটা আপেল গলা থেকে সরছে না
গলায় একটা ছুরি আটকে আছে

মনে হয়, পা অচল, ফুলে ঢোশঢোশ
মনে হয়, সারা শরীর বিষে ঝরঝর।

Poem: Why I don't write about George Floyd.

টোয় ডেরিকট কালো নারী, কিন্তু দেখতে সাদাভ। জন্মেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে হেমটেম্ক অঞ্চলে ১৯৪১ সনের ১২ই এপ্রিল। জন্মসূত্রে ফ্রানজে ফানোঁ-র কালো চামড়া সাদা মুখোশ পরিস্থিতির ভিতর বড় হয়ে উঠতে হয় তাঁকে। কিন্তু ডেরিকট কখনোই চাননি তাঁর কালো মুখে কোন সাদা মাস্ক লাগানো থাকুক। ফলে ডেরিকটের ব্যক্তিত্বে, লেখালেখির অন্দরমহলে এই জেদ, সংশয়, নাজুকতাটুকু আগাগোড়াই দেখা যায়। ধরা যাক, ডেট্রয়েটের নিরিবিলি সাদা পাড়ায় একটি বাড়িতে উঠতে চান তিনি, বাইরে সাদা দেখা যাবার কারণে অবলীলায় ঝাঁকের সাদা কই ঝাঁকে মিশে যেতে পারেন। কিন্তু ফল হয় উল্টো– টোয় বরং তীব্র মর্মপীড়ায় ভোগেন– কেন তাকে সাদা দেখা যায়। তিনি তাঁর কবিতায়, গদ্যে, আলাপে নিরঙ্কুশ অন্তর্গত সত্য কথাটি বলে যান। এজন্যই তিনি বলেন– আমি কবিতা লিখিই সত্য কথার অস্বস্তিটুকু বলবার সুবিধা উপভোগ করার জন্য।

ডেরিকট যে পরিবারে বড় হয়ে ওঠেন– তার থেকে যৌগিকভাবে পাওয়া দারিদ্র্য, মৃত্যু, শঙ্কা, অন্যায়, বর্ণাঘাত, অনিশ্চয়তার বীজানু তিল তিল করে মিশিয়ে দেন কবিতার মৃদু বিদ্যায়।

স্বাভাবিকভাবেই টোয় ডেরিকট সামষ্টিক মর্যাদা কার্যকর করার কর্মকাণ্ডে সরব ও মৌলিক।

– *অনুবাদক*

এর কোনো প্রয়োজন নেই/প্রিয় মা...

সাফো
ভাষান্তর: অনন্ত মাহফুজ

এর কোনো প্রয়োজন নেই
প্রিয় মা, আমি
আমার বুনন শেষ করতে পারছি না
তুমি বরং আফ্রোদিতিকে দোষ দিতে পারো
আমাকে সে প্রায় হত্যা করেছে
এক সদ্য যুবকের প্রতি আমার
আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে।

Poem: It's No Use/Mother Dear...

এন্ড্রোমেডার প্রতি

সাফো

ভাষান্তরঃ অনন্ত মাহফুজ

তুমি যখন শুয়ে থাকবে মৃত, তোমার কোনো স্মৃতি অবশিষ্ট থাকবে না
অতপর তোমার কথা কারও মনে পড়বে না, কারণ তুমি তো
পিয়েরিয়ার গোলাপ ছিলে না। এবং হেডিসের গৃহে তুমি
অলক্ষিত ঘুরে বেড়াবে, দৌড়ুবে বিবর্ণ মৃতদের পিছনে।

Poem: To Andromeda.

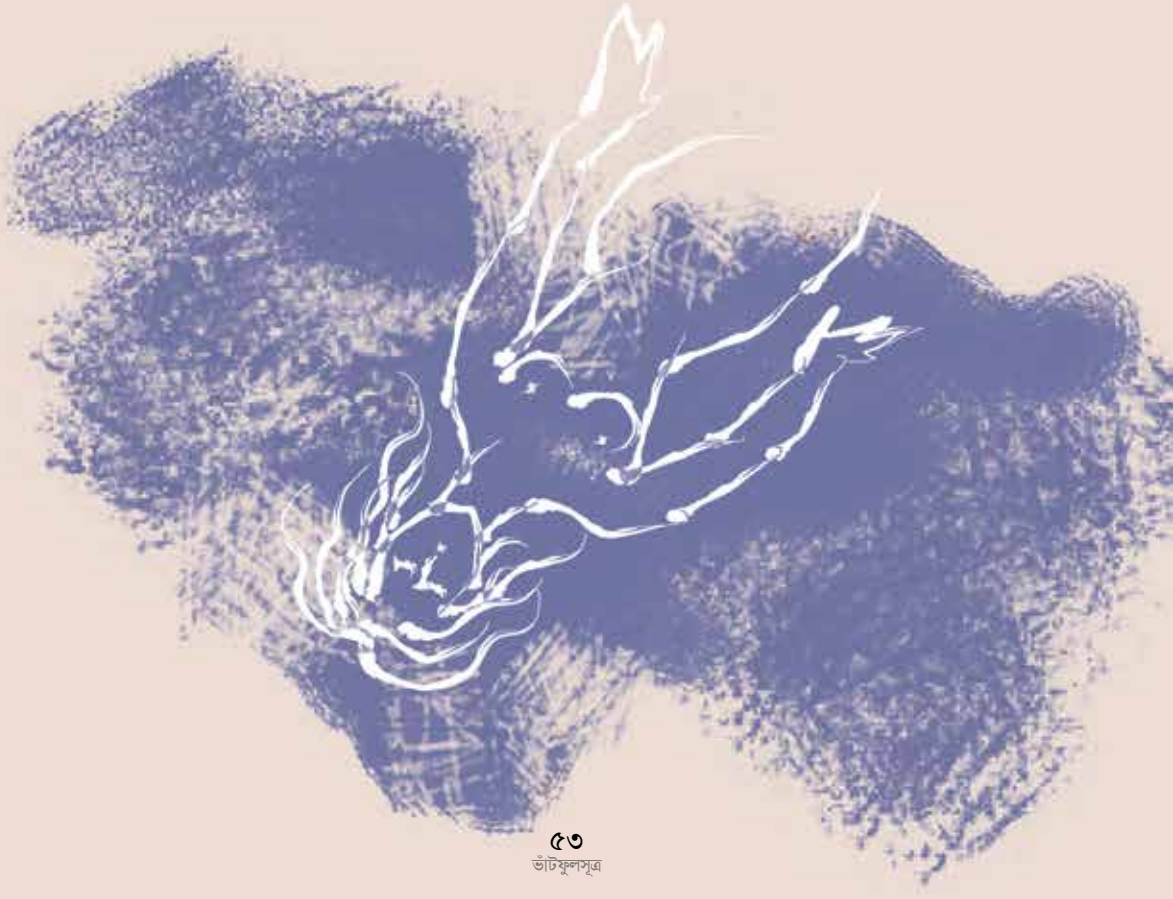

নিজেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম

সাফো

ভাষান্তর: অনন্ত মাহফুজ

নিজেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম
সাফো, তুমি কি
এমন একজনকে এনে দিতে পারো
আফ্রোদিতির মতো যার
সবকিছু আছে?

Poem: I Asked Myself.

আফ্রোদিতি বন্দনা

সাফো

ভাষান্তর: অনন্ত মাহফুজ

শৈল্পিক বসনে সজ্জিত আফ্রোদিতি, অমর
জিউসের কন্যা এবং কৌশলের কারিগর তোমার কাছে প্রার্থনা
আমাকে নিরাশ করো না, যাতনায় মন ভেঙে দিও না আমার
নেমে এসো, এখন অথবা যখন
আমার ডাক শুনবে ওপর থেকে, সাড়া দিও; তোমার পিতার সোনালী গৃহ ছেড়ে
নেমে এসো তখন
তোমার বাহনে চড়ে, সুন্দর ঘুঘুরা
টেনে নেবে অন্ধকার পৃথিবীর দিকে, বাতাসে
সুন্দর পাখায় ঘূর্ণি তুলে স্বর্গের চূড়া থেকে
নিচের আকাশ ধরে তৎক্ষণাৎ নেমে এসো
এবং তারপর, হে আমার দেবী
তোমার শাশ্বত মুখে হাসি ফুটিয়ে জানতে চাইবে, কী হয়েছে
আমার, এবার কেন তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

এখন যা আমি খুব করে চেয়েছি
আমার ক্ষুধার্ত হৃদয়ে: "এবার কাকে তার ভালোবাসার কাছে
ফিরে আসতে পটাতে হবে? এবার কে সে, আহা
সাফো, কে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে?
যদি সে নারী তোমাকে ছেড়ে গিয়ে থাকে, সে-ই তোমাকে অনুসরণ করবে;
তুমি যা দিতে চাও তাকে যদি গ্রহণ না করে সে, সে-ই তা তোমাকে দেবে;
যদি সে ভালো না বাসে তোমাকে, শীঘ্রই সে ভালোবাসবে তোমাকে,
ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও।"
আমার কাছে আসো আবার, এবং আমাকে মুক্ত করো
এই অসহ্য চাওয়া থেকে। আমার সর্বান্তকরণ যা চায় ঘটাতে
ঘটাও তা। আর আমার পাশে দাঁড়াও,
দেবী, বন্ধু আমার।

Poem: Ode to Aphrodite.

প্রাচীন গ্রীক কবি সাফো সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। তার জন্ম ৬৩০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে গ্রীক লেসবোস দ্বীপপুঞ্জের এক অভিজাত পরিবারে। তার কয়েকজন ভাই ছিল। সাফো সেরেসিলাস নামে এক ধনী ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং ক্লেইস নামে তাদের একটি কন্যা ছিল। তিনি যৌবনের বেশিরভাগ সময় লেসবোসের মাইটিলিন শহরে কাটিয়েছেন যেখানে তিনি অবিবাহিত যুবতীদের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন বলে জানা যায়। একজন নিবেদিত শিক্ষক এবং কবি হিসেবে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সাফো। অনেকে বলেন, এক নাবিক যুবকের প্রেমে ব্যর্থ হয়ে পাহাড়ের চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে অল্প বয়সে তিনি আত্মহত্যা করেন। অন্যদিকে, তিনি ৫৭০ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন বলে অনেক গবেষক মনে করেন।

তার বিশাল কাব্য ভাণ্ডার থেকে মাত্র ৬৫০ লাইন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। সাফোর কবিতা সে-সময়ে খুব প্রশংসিত হয়েছিল এবং তাকে 'পয়েটেস' হিসেবে অভিহিত করা হতো, যেমন হোমারকে 'পোয়েট' হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। সাফো তাঁর গীতিকবিতার জন্যই বেশি পরিচিত, তার লেখা সংগীতবহুল। প্লেটো তাঁকে 'The Tenth Muse' বা কলা ও বিজ্ঞানের দশম দেবী হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।

তার মৃত্যুর তিন শতাব্দী পরে নিউ কমেডির লেখকগণ সাফোকে বাছবিচারহীন এবং একইসাথে লেসবিয়ান হিসেবে বিদ্রূপ করেছিলেন। লেখার বিষয় ও তার জন্মস্থান লেসবোসের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে লেসবিয়ানও বলা হতো। ১০৭৩ সালে পোপ গ্রেগরি সাফোর নয় খণ্ডে সংগৃহীত লেখা পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। সমকাম ও যৌনতার যে অভিযোগ উপস্থাপন করে তার সমস্ত কাজ ধ্বংস করা হয় সে সম্পর্কে এখন আর নিশ্চিত হওয়ার তেমন সুযোগ নেই। তবে সব মিলিয়ে এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, তার কবিতা ধর্মীয় ভন্ডামিকে আঘাত করেছিল। তার যে উদ্ধারকৃত গীতিকবিতা মূল্যায়নে বলা যায়, তিনি যে কোনো যুগের অন্যতম সেরা গীতিকবি। – *অনুবাদক*

একটি আর্ট

এলিজাবেথ বিশপ
ভাষান্তরঃ কুমকুম বৈদ্য

হারিয়ে ফেলার আর্টটা রপ্ত করা বেশ সহজ
হারানো মানেই খারাপ কিছু নয়
তুমি প্রতিদিন নিয়ম করে হারানো প্র্যাক্টিস করতেও পারো
দরজাটা হারিয়ে ফেললে, আর কারো নয় শুধু কলিংবেলের মনখারাপ
দিনে দিনে হারাচ্ছি সব নাম আর জায়গা গুলো
যাদের আমি ছুঁতে চাইতাম
এতে অবশ্যই কোথাও পাতা ঝরার শব্দ হয় না
হারানোর তালিকা বেশ দীর্ঘ আমার
মায়ের ঘড়ি, তিনটি প্রিয় বাড়ি, হারিয়েছি দুটি শহর, ভাস্টার,
আমার পায়ের তলার মাটি, দুটি নদী, একটি মহাদেশ।
আমি তাদের মিস করি খুব
তবুও বাতাস বয়ে চলছে নিজের মতো
তোমাকে হারাতেও
আমি মিথ্যা বলিনি!

হারিয়ে ফেলার আর্টটা রপ্ত করা কঠিন নয়
যদিও মনে হয় হারানো মানে মহাপ্রলয়

Poem: One Art.

একটা গান– আমার প্রয়োজন

এলিজাবেথ বিশপ
ভাষান্তরঃ কুমকুম বৈদ্য

গান, একটা গান ভেসে আসুক শুধু আমারই জন্য
নিয়ে যাক সমস্ত বিষাদ আঙুলের ডগা চিরে
ছুঁয়ে যাক কলঙ্ক লাগা থরথর কাঁপা ঠোঁট
গভীর অথচ সহজ সরল দিঘীর জলের মত শান্ত মায়াবী সুর
সারিয়ে দিক সব পুরোনো ক্ষত
মৃতদেরও শুনিয়ে যাক ঘুম পাড়ানিয়া
সেই গান ফিকে রং হোক মহাসমুদ্রে
উপহার দিয়ে যাক একটু থেমে থাকা
শরীর জুড়ে বৃষ্টি নামুক শীতল সুর
ভেসে থাক চাঁদ সবুজ দিঘীর জলে
ছন্দ থাক ঘুমের বাহুতে রাখা।

Poem: I Am In Need of Music.

এলিজাবেথ বিশপ (ফেব্রুয়ারি ৮, ১৯১১ – অক্টোবর ৬, ১৯৭৯) একজন আমেরিকান কবি এবং গল্প লেখক। ১৯৫৬ সালে কবিতার জন্য পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী। ১৯৭০ সালে জাতীয় গ্রন্থ পুরস্কার বিজয়ী এবং সাহিত্যের নিউস্টাড্ট আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত। ডুইট গার্নার বলেছিলেন যে তিনি সম্ভবত "বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে খাঁটি প্রতিভাশালী কবি"।
এলিজাবেথ বিশপ, উইলিয়াম থমাস এবং জের্ট্রুড মে (বুলার) একমাত্র সন্তান । বিশপের জন্ম আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস-এর ওয়ার্সেস্টার শহরে। তার বাবা, একজন সফল নির্মাতা, এলিজাবেথ বিশপের আট মাস বয়সে মারা যাওয়ার পরে, বিশপের মা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন (বিশপ তার মায়ের লড়াইয়ের সময়টি তাঁর ছোট গল্প "দ্য ভিলেজে" লিখেছিলেন)।
যেখানে রবার্ট লোয়েল এবং জন বেরিম্যানের মতো তাঁর উল্লেখযোগ্য সমসাময়িকদের মধ্যে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের অন্তরঙ্গ বিবরণগুলি তাদের কবিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে তৈরি করেছিল, বিশপ এই স্টাইলটি এড়িয়ে গেছেন। বিশপের লেখার স্টাইলটি যদিও মাঝে মাঝে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বিবরণ জড়িত,তবুও তাঁর লেখা দূরবর্তী দৃষ্টিকোণের জন্য পরিচিত।
বিশপ নিজেকে "লেসবিয়ান কবি" অথবা "নারী কবি" হিসাবে দেখেন নি। যেহেতু তিনি তাঁর কাজ সর্ব-নারী কাব্যগ্রন্থে প্রকাশ করেননি, তাই নারী আন্দোলনের সাথে জড়িত অন্যান্য নারী কবিরা ভেবেছিলেন যে তিনি এই আন্দোলনের প্রতিকূল ছিলেন।
– *অনুবাদক*

কবিতার আকাশ

লেসলি মারমন সিলকো
ভাষান্তর: নিশাত শারমিন শান্তা

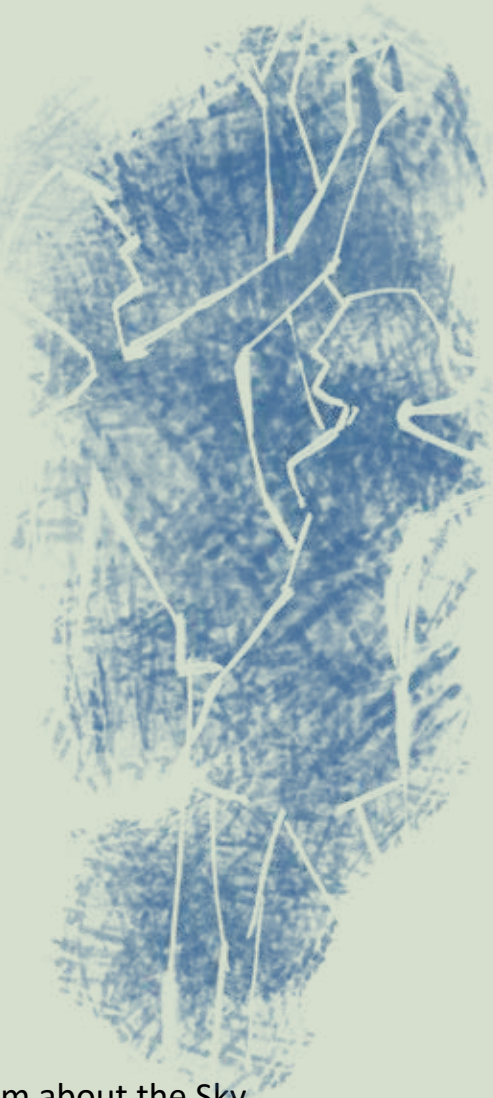

চলো, আজ আকাশ লিখি
লিখি কোনো কবিতা শরীরে
তার আগে রাখি না চোখ, চলো
রাখি চোখ আকাশের চোখে।

সে কি শুধু দূরের আকাশ?
নাকি এক তুষারতটিনী?
বুক পেতে নীল বেদনায়
শাদা পাখি তুষারিত শোক
দ'লে হাঁটে এলোমেলো পায়

এই যে আকাশ ঘন নীল
অসীমের বাঁশি বাজে নীলে
সেই সুরে পৃথিবীও লীন
শ্বাস হয়ে মিশে আছে শ্বাসে

ওই যে শ্বাসের হাওয়া বয়
সে হাওয়ায় ভেসে যায় মেঘ
অরুণ আভায় ছিলে যায়
কুয়াশাকাতর নিশিত্বক
চুঁইয়ে চুঁইয়ে নামে নীল
আমরা আকাশ বলি তাকে।

Poem: How to Write a Poem about the Sky.

একাধারে ঔপন্যাসিক, কবি এবং প্রাবন্ধিক লেসলি মারমন সিলকো নেটিভ আমেরিকার বিভিন্ন ঘটনাকে শব্দছন্দে বাঁধার জন্য পরিচিত। ১৯৪৮ সালে ফটোগ্রাফার লি মারমন এবং তাঁর স্ত্রী মেরি ভার্জিনিয়ার সংসারে আগমন তাঁর। একই সাথে মেক্সিকান, অ্যাংলো-আমেরিকান এবং আদিবাসী লেগুনা পুয়েব্লো জাতির রক্ত বয়ে চলেছে তাঁর ধমনীতে। বিভিন্ন লেগুনা মীথ, গল্প, উপকথা তাঁর লেখালেখির প্রাণ। তাঁর গল্প বলার ধরণটাও আদিবাসী কথক ধরণের। ১৯৬০ সাল থেকে শুরু হওয়া নেটিভ আমেরিকান রেনেসাঁর একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব তিনি। তাঁর সাহিত্যকর্ম যেমন নেটিভ আমেরিকানদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরে, তেমনি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও আধুনিক জীবনের সাথে নেটিভদের তাল মিলিয়ে চলাকেও উৎসাহিত করে চলে। মূলত ঔপন্যাসিক হলেও কবি হিসেবে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি আছে আমেরিকায়। – *অনুবাদক*

বুদ্ধিমান বুদ্ধিজীবী

হূবনাথ পান্ডে
ভাষান্তরঃ স্বপন নাগ

ওরা এখন চুপচাপ।
ওরা এখন হিসেব কষায় ব্যস্ত--
চুপ থাকার পুরস্কার
না বলার জন্যে শাস্তি
কোনটি বেশি ভালো,
বিবেকের ডাক
না পাওনার ঝুলি
কোনটি বেশি মধুর,
বিচারের বাচালতা
না বিচারের দাবিতে সোচ্চার হওয়া
ক্ষতি কম কীসে!

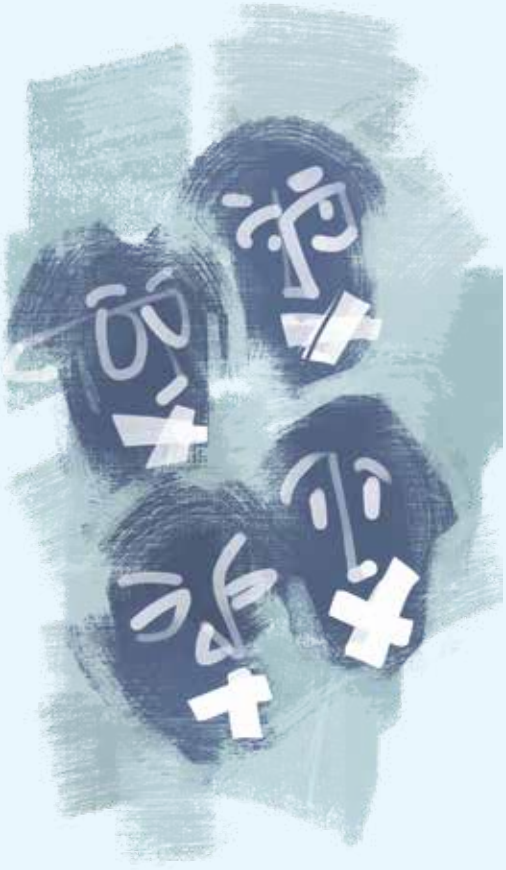

কাল সবাই যখন বলবে
বলার কোনো অর্থই থাকবে না আর
কেন না শোনার কথা ছিল যাদের
হয় তারা মরে গেছে
অথবা হেরে গিয়ে
ফিরে গেছে যে যার শিবিরে।

তখনই, ঠিক তখনই
উচ্চকণ্ঠে বলে উঠবে যে
সে-ই পুরস্কৃত হবে।
এখন সেই দিনটির জন্যে দরকার
গলার, এমনকি কলমেরও
শক্তিটুকু বাঁচিয়ে রাখার!

এখন নীরব সমস্ত বুদ্ধিজীবী
বলার জন্যে হয়তো
নাম উঠতে পারে সুলতানের ডায়েরিতে,
হয়তো হতে পারে এফ আই আর;
তার চেয়ে বরং ভালো
নীরবতার পক্ষেই সাজানো যাক যুক্তির জাল,
তোলা যাক তর্কের ঢেউ --
সে তর্কে পীড়িতরা থাক এমনভাবেই
শাসকেরও যেন পছন্দ হয় তা!

ভয়

হূবনাথ পান্ডে
ভাষান্তরঃ স্বপন নাগ

আমি বললাম
ভারত এক কৃষিপ্রধান দেশ

লোকেরা চমকে উঠল
মঞ্চেবসা লোকেদের মধ্যে
শুরু হয়ে গেল কানে কানে ফিসফাস

আমি বললাম
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ...
তখনও শেষ হয়নি আমার বাক্য
লোকেরা ভয় পেয়ে গেল

সভার অধ্যক্ষ মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখল
কিছু ইশারা করছিল সঞ্চালক
আমি বুঝতে পারিনি

আমি বলেই চললাম
ধর্মনিরপেক্ষতা
আমাদের সংবিধান ...
ততক্ষণে মঞ্চ ছেড়ে চলে গেছে কিছু লোক

শ্রোতারা খুব মন দিয়ে
ভয়ে ভয়ে আমাকে দেখছিল
পরিবেশ হালকা করার জন্য
চুটকি শোনাতে চাইলাম--
'রাজা মন্ত্রীকে বললেন ...'
ধীরে ধীরে সভা ত্যাগ করতে লাগলো সবাই

কেউ একজন এসে বন্ধ করে দিলো মাইক
আমার নিজেরই আওয়াজ
নিজের কানেও পৌঁছুল না আমার

সভাকক্ষে এখন আমি একা
ভারতের রাষ্ট্রীয় একতার বিষয়ে
আমারই চিরকুট নিয়ে
মনে মনে পড়ার চেষ্টা করতে থাকি
আর ভয় পেতে থাকি

হিংস্রমেবজয়তে

হূবনাথ পান্ডে
ভাষান্তরঃ স্বপন নাগ

দাড়িতে চোয়াল ঢেকে গেলেও
একটুও কমে না সিংহের হিংস্রতা,
শুধু লুকিয়ে থাকে চোয়ালে লেগে-থাকা রক্ত।
গর্জনের বদলে যদি হাসি ফোটে মুখে
ক্রুরতা তার কমে না একচুলও,
একত্রিত হতে থাকে শুধু
রেশমী লোমে-মোড়া থাবার ক্ষিপ্রতা,
বরং আরও বাড়তে থাকে।
আর যদি সে বিনম্রভাবে ঘোষণা করে
তার শিকার ত্যাগের কথা,
তবে মিথ্যে নয়
দারুণ একটি রসিকতা হয়ে ওঠে মাত্র।
খানিক লঘু হয় তাতে
সিংহের হাতে নিরীহ প্রাণীদের মরার ভয়।
যদি সে বলে
গরুছাগলদের জন্যে তার দুঃশ্চিন্তার কথা,
তাদের বাচ্চাদের নিয়ে দুর্ভাবনার কথা,
কল্পনায় থাকে জেনো তাদের নরম মাংস।
মুখ থেকে ঝরে-পড়া লালা
মখমলী বস্ত্রে খুব সাবধানে মুছতে মুছতে
মিথ্যে খুশির রঙে নিজেই লুকোয়
নিজেরই হিংস্র চোখের চমক!

সিংহ যদি ঘাস খায়
জেনো, মস্তিষ্ক নয়, খারাপ তার উদর।
যুগ যুগ ধরে শিকার হয়ে-আসা প্রাণীদের
চতুর সিংহ আশ্বস্ত করে --

হিংস্রমেবজয়তে

হূবনাথ পান্ডে
ভাষান্তর: স্বপন নাগ

এবার থেকে আর
একটিও দুর্বল পশু মরবে না জঙ্গলে!

আর তা জেনেই প্রতিবারের মতো
আরও একবার অবোধ গরুছাগলের দল
চলতে থাকে সিংহেরই সঙ্গে,
যেরকম পূর্ণ বিশ্বাস আর ভরসায়
কসাইয়ের সঙ্গে চলতে থাকে গরু মহিষ...

আধুনিক হিন্দি কবিতার জগতে হূবনাথ পান্ডে চর্চিত একটি নাম। বহুচর্চিত তাঁর কবিতা। এই সময়, এই সময়ের বৈষম্য, কুসংস্কার, জাতপাতের সমস্যায় দীর্ণ ভারতীয় সমাজ, রাজনীতিকদের নীতিহীনতা, রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী মনোভাব ... এ সবই কবি হূবনাথ পান্ডের কবিতার বিষয়। তাই তাঁর বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর শোনা যায় তেলুগু কবি ভারভারা রাওকে সামনে রেখে লেখা কবিতা 'এক বুঢ়া'-য়। লেখেন, 'করোনার ভয়াবহ এই আবহে / ত্রস্ত রাষ্ট্রের এত ভয়! / এত ভয় একজন জরাগ্রস্ত বুড়োকে? / তার কবিতাকে? তার জড়িয়ে-আসা উচ্চারণকে?' পরেই তিনি লেখেন, 'এ কথা তো সত্যিই -- / আলোর ক্ষীণ একটি বিন্দুকে আজও / ভয় পায় জমাট অন্ধকার!' – *অনুবাদক*

আমার কাছে লেখা হচ্ছে একজন লেখকের জন্য একটি প্রচণ্ড দায়বদ্ধতা

কবি আন্তোনেলা আনেডার প্যারিস রিভিউ সাক্ষাৎকার

সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন: সুজান স্টুয়ার্ট

অনুবাদ: লুনা রাহনুমা

সমসাময়িক ইতালীয় কবিদের মধ্যে অন্যতম প্রশংসিত কবি আন্তোনেলা আনেডা। জন্ম ১৯৫৫ সালের ২২ ডিসেম্বর। তার প্রতিটি লেখায় খুব নির্ভুল এবং নমনীয় শব্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মানব ইতিহাস ও পৃথিবীর ভৌগোলিকতার সাথে কবির অন্তরঙ্গ পরিচিতির সাক্ষ্য বহন করে তার লেখাগুলো। এ পর্যন্ত ছয়টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা লিখে কবি পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার। যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য – প্রিমিও মন্টেল, প্রিমিও লেটারেরিও ভায়ারেগজিও-রাপাচি এবং প্রিমিও পুউকিন। ২০১৯ সালে তিনি সরবন থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট পেয়েছেন। সুজান স্টুয়ার্ট এর নেয়া আন্তোনেলা আনেডার ৮ হাজারের বেশি শব্দের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছিল প্রখ্যাত সাময়িকী দ্যা প্যারিস রিভিউ এ, ২০২০ সালের শরৎ/হেমন্ত সংখ্যায়, ইস্যু ২৩৪। – অনুবাদক

আরো অনেক ইতালীয় কবিদের মতো আনেডাও সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি একজন প্রাজ্ঞ মানুষ, শিক্ষক এবং শাস্ত্রীয় ও ফরাসি সাহিত্যের অনুবাদকও। শরৎ ও বসন্তে তিনি রোমে নিজের বাড়ি থেকে লুগানোতে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক সাহিত্য পড়াতে যান। গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে কবি চলে যান লা মাদালেনার দ্বীপপুঞ্জে। কয়েক বছর ধরে জাতীয় প্রেসে তাঁর কবিতা প্রকাশ হবার পর, এখন তার লেখাগুলো মর্যাদাপূর্ণ আইনাডি কোলাও বিয়ানকা সিরিজেও ছাপা হচ্ছে। অ্যাংলোফোন পাঠকরা জেমি ম্যাককেড্রিকের করা দুর্দান্ত অনুবাদ আর্কিপেলাগো (২০১৪)- তে বিশ বছর পেছন পর্যন্ত আনেডার কবিতা পড়তে পারবেন।

এই সাক্ষাৎকারটি কিছুটা ২০১৮ সালের নভেম্বরে এবং দ্বিতীয়বার ২০১৯ সালের অক্টোবরে নেয়া হয়েছিল, রোমের মন্টিভার্ডে আনেডার অ্যাপার্টমেন্টে বসে। একটি সরু চারতলা বিল্ডিং দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ি রাস্তার মাঝখানে, যার শেষে আছে খোলা বাজার। এই বিল্ডিংয়ের তিনতলায় থাকে কবির পরিবার। পঞ্চাশের দশকে এই দেশের সরকার ইতালীয় আধাসামরিক পুলিশ অফিসারদের জন্য এই বিল্ডিংগুলোর কাঠামো তৈরি করে দিয়েছিলো। আনেডার দাদা তখন কিনেছিলেন তাদের এই এপার্টমেন্টটি। আনেডা এবং তার স্বামী ফ্লামিনিও মার্মিলি, যিনি জেমেলি হাসপাতালে একজন পালমোনোলজিস্ট, তারা ১৯৯৪ সাল থেকে বাস করতে শুরু করেন এই এপার্টমেন্টটিতে। সাথে আছে তাদের মেয়ে, মারিয়া সোফিয়া, যিনি ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসবিদ। বাল্যকাল থেকেই মারিয়া সোফিয়া তাই বেড়ে উঠেছে আনেডার দাদীর

নানারকম স্মৃতিচিহ্ন, বই, চিত্রকর্ম আর পুরোনো একটি পিয়ানোর ছোঁয়ায়।

আমরা বসেছিলাম কবির বাড়ির লিভিং রুমে। কথা বলছিলাম ইতালীয় এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই। সাক্ষাৎকারটি নেয়ার সময় কবি একটি গুরুতর অসুস্থতা থেকে সেরে উঠছিলেন। তাই আমাদের কথাবার্তা বারবার চলে যাচ্ছিলো অতীতের দিকে। আর জীবনমুখী কবিতাগুলো ছিল আমাদের আলোচনার কেন্দ্রস্থলে। বরাবরের মতোই আনেডা যতক্ষণ আমার সাথে কথা বলেছেন তিনি কথা বলেছেন খুব সততার সাথে এবং অপ্রয়োজনীয় বাক্যালাপ এড়িয়ে গিয়েছেন নিঃশব্দে; আনেডা সবসময়ই কথোপকথনে আজেবাজে বক্তব্যকে এড়িয়ে যান, যেমন তিনি তার কবিতাগুলিতে এড়িয়ে চলেন। নিরিবিলি আর আরামদায়ক একটি ঘর। ঘরের আর্মচেয়ারগুলি গাঢ় নীল রঙের। পড়ন্ত বিকেলের নরম সূর্যের আলোতে ভরে যাওয়া ঘরখানি। ঘরের দেয়ালে ঝুলছে ইতালীর একটি বিশাল মানচিত্র।

আনেডার সাথে আমার এক দশকেরও বেশি সময় ধরে পরিচয়। আমাদের পথ অনেকবার মিলিত হয়েছে একসাথে অক্সফোর্ড, নিউক্যাসল, বার্লিন, নেপলস এবং রোমে। আমরা প্রায়শই ট্রস্টেভেরে এবং শহরের কেন্দ্রে দেখা করি, বইয়ের দোকানগুলিতে কথা বলতে ও বই পড়তে যাই। এই সাক্ষাৎকার গ্রহণের সময় ও সাক্ষাৎকার নেয়া শেষ হয়ে যাবার পরেও, এই লেখাটি গুছানোর প্রয়োজনে আমরা দুই জন দুই ভাষাতেই ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছি অনেকবার। আনেডা নিজের উত্তরগুলো চমৎকারভাবে বর্ণনা করে জানিয়েছে আমাকে ইতালীয় ভাষায়।

কবিতার সাথে আপনার পরিচয়ের প্রথম স্মৃতি কোনটি?

আমি জীবনে প্রথম যে কবিতাটি শুনেছিলাম তা ছিল আলেকজান্দ্রর ব্লক এর লেখা। আমি সার্ডিনিয়ার একটি ছোট্ট গ্রামে রেডিওতে তখন শুনেছিলাম কবিতাটি। এটি আলেকজান্দ্রর শুরুর দিকের একটি লেখা। কবিতাটি অনেকটা এভাবে শুরু হয়েছে "বাতাসের সাথে ভেসে আসা / বসন্তের সংগীত অনেক অনেক দূর থেকে প্রবাহিত।" কবিতাটি মহাকাশ ও বায়ুমণ্ডল নিয়ে লেখা। বাতাস কীভাবে মেঘগুলোকে ভেঙে দিয়ে আকাশের নীল স্তর প্রকাশ করে মানুষের জন্য, সেই কথা বলা হয়েছে কবিতাটিতে।

আপনাকে কবিতা লিখতে উৎসাহী করেছে কোন জিনিসটি সর্বপ্রথম?

আমার বয়স যখন সাত বছর, তখন আমার পরিবারের এক সদস্য, এমন এক ব্যক্তি, যাকে আমি খুব ভালবাসতাম, তিনি মারা যান। কয়েকদিন আগেও শব্দ করা জীবিত একজন মানুষকে দেখলাম, হঠাৎ করে শব্দহীন হয়ে গেলো। তারপর ব্লকের এই কবিতাটি যখন শুনি – আমার বয়স তখন তেরো বা চৌদ্দ – রেডিওতে কবিতাটি শুনে আমার মনে হয়েছিল, হয়তো কবিতা পারে মানুষের মনের সাথে অনুপস্থিত ব্যক্তির, মৃত্যুর সাথে, ভিন্ন জগতের সাথে একরকম সম্পর্ক তৈরি করতে। বর্তমানকে অতীত অথবা ভবিষ্যৎ স্থান ও সময়ে স্থানান্তর করতে পারে কবিতা।

অনুপস্থিত ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক তৈরি হবার এই ব্যাপাটির কারণেই কি আপনি কবিতা লিখছেন?

আমি বাস্তব উপলব্ধিকে উস্কে দিতে এবং একই সাথে ম্লান করার উদ্দেশ্যেই লিখি। এমিলি ডিকিনসন যখন বলেন, "একটি কাপে আমাকে সূর্যাস্ত এনে দাও / সকালের পতাকাগুলি গুনে বলে দাও।" - এই কবিতার অলৌকিক উপলব্ধিটি হলো যে, ঘরোয়া এবং সার্বজনীন সম্পর্কের স্থানচ্যুতি। দৃশ্যমান ব্যাপারগুলো এখানে রয়েছে, তবে সাধারণ দৃষ্টিকোণ এবং স্কেল থেকে মুছে ফেলে সেগুলোকে পুনরায় কল্পনা করা হয়েছে অন্যভাবে।

তাহলে কি যা কিছু দৃশ্যমান, এবং এই দৃশ্যমান বিষয়গুলোর কাল্পনিক অবয়বই আপনার কাছে কবিতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা?

কবিতা বাস্তবকে বাস্তব করে তোলে। এই রকম স্থানান্তরিকরণের বিষয়গুলো আমাকে খুব আনন্দ দেয়। কবিতা লেখা মানে, নিজেকে গভীরভাবে মনোযোগী করে তোলা। চারপাশের শব্দ কিংবা আলো ধরতে পারা। এলিজাবেথ বিশপ যেমন নিজের সম্পর্কে লিখেছেন, "আমি ঘটনাটি দেখেছি," আমি কিন্তু বলবো, "আমি সবটুকু শুনেছি।" নিজের সম্পর্কে আমি বলি, গাণিতিক মন নিয়ে হেঁটে চলা একটি খরগোশ আমি।

আপনার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে আপনার প্রথমদিকের লেখাগুলোর সম্পর্ক সম্পর্কে একটু বলবেন কি? চাক্ষুষ উপলব্ধি, শব্দ ও সুর, এমনকি যদি গণিতের কথা যদি বলি – আপনার কবিতা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐতিহ্যের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছে বারবার।

চৌদ্দ থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত আমি যে ধরণের স্কুলে পড়াশোনা করেছি, সেগুলোকে আমরা ইতালীতে লাইসো ক্লাসিকো বলি। সেখানে একজন শিক্ষার্থী লাতিন এবং গ্রীক শেখে। সেইসাথে গণিত, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন শেখার পাশাপাশি ইতালীয়, ইউরোপীয় এবং আমেরিকান সাহিত্যের জ্ঞান অর্জন করে। আমি বিশ্বাস করি, ইতালীয় শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম দুর্দান্ত একটি গুণ হলো যে, সেখানে কিশোর-কিশোরীদের ক্ল্যাসিক সাহিত্য মূলভাবে, মূলভাষাতেই পড়ানো হয়। আজও আমি যখন গ্রীক বা লাতিন ভাষায় কোনও পাঠ্য দেখি, আমি সেটি থেকে দূরে থাকি। আবার একই সাথে বলতে হবে, শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কোন নিয়ম নেই।

আপনার কবিতার ভেতর মনে হয় অনেক সময় অনেকভাবে ভূমধ্যসাগরীয় ঐতিহ্যের ছোঁয়া পাওয়া যায়। খুব পুরোনো রীতির গান, পালা, শোকের ছায়া দেখা যায় যেগুলোকে দ্বৈত বলা যায়, অর্থাৎ অতি পুরাতন আভিজাত্য নতুনত্বের আঙ্গিকে। গ্রাম্য

রাখালদের চারণ কবিতা, সংশোধনমূলক পালাগান, উত্তর আফ্রিকার সংগীত ও প্রথার মিলিত ঐতিহ্য এই সবকিছুর সমন্বয়, কিন্তু আপনার কবিতায় এরা খুব আধুনিকভাবে উপস্থিত হয়েছে। ট্রাম্পেটার এবং সুরকার পাওলো ফ্রেসু, ইতালীয় জনপ্রিয় সংগীতের উপর আমেরিকান জিআই-এর আনা জ্যাজ রেকর্ডগুলির প্রভাবের কথা বলেছেন। আপনার এবং আপনার প্রজন্মের অন্যান্য কবিদের উপর কি জ্যাজ সংগীতের দুর্দান্ত প্রভাব ছিল? আপনার কী মনে হয়?

আমার জন্য, হ্যাঁ, জ্যাজ এর সুর ও ছন্দ সব সময়ই খুব কাছাকাছি অনুভব করেছি। বুকের ভেতর খুব গভীর শোকের ব্যথার মতন। জ্যাজের সুর ও ছন্দের ভেতর একটা উদ্বেগ, আতঙ্ক থাকে যা প্রাচীন ছন্দকে ভেদ করে দুলে যায়। শ্বাস প্রশ্বাসের ছন্দের মতন একটা তাল থাকে সেখানে। ফ্রেসু আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এই কথা – সিঙ্গল রিডের সাথে সার্ডিনিয়ান ট্রিপল পাইপ – ফ্রেসার কাছে বিষয়টি টেকনিক্যাল ছিল। এটি ভূমধ্যসাগরের প্রাচীনতম পলিফোনিক উপকরণ। জ্যাজ এবং লেনেড্ডাস হচ্ছে কিছু সংলাপের ভেতর কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস ধরে রাখা।

মৌখিক ঐতিহ্যও কি আপনার কাজকে প্রভাবিত করেছে? চারপাশের শোনা শব্দ, অ্যাটিটোস, শোকগাঁথা, কাহিনীগুলো কি আপনি নিজের ভেতর ধারণ করেই বেড়ে উঠেছেন?

ওসব তো আমার কানে লেগেই আছে সবসময়। সার্ডিনিয়ার প্রতিটি অঞ্চলে উঁচুমানের অনেক মৌখিক কবিতা আছে যেগুলো তাদের পুরোনো ঐতিহ্য। আমার বাবা-মার সাথে ছোটবেলায় সেখানে থাকার সময় থেকেই আমি এই শ্রুতিমধুর কবিতার ফর্মগুলির সাথে পরিচিত হয়েছি। কান্টু আ টেনোর নামে একধরণের কাব্যগাঁথা আছে – যেখানে একটি গানে চারটি পুরুষ কণ্ঠ একে অপরকে প্রশ্ন ও উত্তর দিয়ে গেয়ে থাকে।

গ্লি অ্যাটিটোস – সার্ডিনিয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ঐতিহ্যের একটি অংশ। অ্যাটিটোসের একটি অনিশ্চিত ব্যুৎপত্তি রয়েছে। কোন অ্যাটিটোস হয়তো সন্তানকে মায়ের স্তন্যপান করানো বা নার্সিংয়ের কোনও শব্দ থেকে শুরু হয়েছে। সার্ডিনিয়ার এক পণ্ডিত ম্যাক্স লিওপল্ড ওয়াগনারের মতে, একটি অ্যাটিটোস ছিল "প্রাচীন গান যা তার শ্রোতাদের প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে উৎসাহিত করা হয়েছিল।" তবে সার্ডিনিয়ান ক্রিয়াপ্রেম অ্যাটিটায়ার মোটেও ইতালীয় অ্যাটিজেরের সাথে সম্পর্কিত নয়, যার অর্থ "স্টোক করা", যেমন ঘৃণা প্রকাশের ক্ষেত্রে। আরেকজন পণ্ডিত, ফ্রান্সেসকা পিটালিস, বারবাগিয়ার বিট্টি ও ওরানিতে অ্যাটিটোস নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, খুন হওয়া ব্যক্তির জন্যও যখন গায়করা শোক প্রকাশ করে কিছু গেয়েছেন বা বলেছেন, সেখানেও প্রতিশোধ পরায়ণতার প্রকাশ থাকে না। পিট্টালিস লিখেছিলেন, যে গ্রামের প্রবীণ নারীরা বলেছিলেন যে, অ্যাটিটোস মানে, যারা মারা গেছেন তাদের কথা ছন্দে বলা। আরেকটি ব্যুৎপত্তিবিদ্যা অ্যাটিটোসকে শোক বা কান্নার সাথে সংযুক্ত করে। এই ঐতিহ্যটি আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে।

ঠিক কীভাবে একটু বলবেন কি?

বলতে পারেন ঐতিহ্যেও প্রতি এই প্রবল আকর্ষণটুকু আমি আমার ত্বকের মতো জন্মগতভাবেই পেয়েছি। এটা যেন অনিচ্ছাকৃত এক ব্যথার অভিজ্ঞতা, যে ব্যথাটিকে আমি ভুলে আছি কিন্তু সে ব্যথা সব সময়ই ছিল আমার সাথে। অ্যাটিটোসের ভেতরে তেমনি শোকের কারণে বিলাপের সুর গুনগুন করে বাজে।

পিট্টালিস লিখেছিলেন, সত্তর দশকেও যেসকল নারী অ্যাটিটোস গেয়েছেন, এমনকি অ্যাটিটোদের নাম উচ্চারণ করেছিলেন, তারা শোকবাহক ও কবি ছিলেন। ইফিসিনা ডি গ্রিমেন্টা ছিলেন বিট্টির শেষ শোকার্ত মানুষ (নারী)। তিনি যুদ্ধে মারা যাওয়া ছেলেদের মাকে নিয়ে গান গেয়ে কেঁদেছেন। তার অন্যতম লোকপ্রিয় গানে অপূর্বভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিছু সন্তান হারানো মায়ের কথা, যারা তাদের নিখোঁজ শিশুদের কার্ডবোর্ডের প্রতিকৃতি বানিয়ে রেখেছে ঘরে।

আপনি শিল্প ইতিহাসের উপরে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন। শেষ করেননি কেন?

সতেরো শতকের ভিনিশিয়ান আর্টের ইতিহাসের উপর আমার একটি ডিগ্রি নেয়া আছে। আমি সম্মাননা এবং একটি প্রকাশনা পেয়েছিলাম সেখানে। ভেনিসে আমি চিনি ফাউন্ডেশন থেকে বৃত্তি পেয়েছিলাম – আমি বিশেষায়িত পরীক্ষায়ও পাস করেছি। সংক্ষেপে, আমার একটি "উজ্জ্বল ক্যারিয়ার" হবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু হতাশাময় কতগুলো বছর এবং ক্ষুধামন্দা বা ইটিং ডিসঅর্ডারের পরে আমি লেখাপড়ার ঐ অধ্যায়টি বাদ দেই। রোমে ফিরে আসি তখন। সেই বছর কয়টি ছিল আমার "নিস্তেজ" জীবন। তারপর আমি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠলাম। আমি একটি যাদুঘরে কাজ করেছি এবং সংবাদপত্রের জন্য লিখতে শুরু করি। তবে আমি মনে করি, হতাশার সেই সময়টুকুর অভিজ্ঞতা থেকে আমি যে ধরণের শিক্ষা পেয়েছি, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার জন্য। এটি আমাকে শিখিয়েছে, কোনকিছুর বিশদ বিবরণকে উপেক্ষা না করতে। আমি সচেতন হয়েছি ভাবতে, চোখের সামনে যা দেখছি তার পেছনের কারণ কি হতে পারে। ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক প্রসঙ্গে, পৃষ্ঠপোষকের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে শিখিয়েছিল আমাকে সেই বিষন্ন দিনগুলোর অভিজ্ঞতা।

সেই কঠিন সময়টির দিকে ফিরে তাকালে আপনার কি মনে হয় যে, সেই সময়ের কাঠিন্যই আজ আপনাকে কবি বানিয়েছে?

অপ্রাপ্তির এক গভীরবোধের সাথে লড়াই করে সেই বছরগুলি কাটিয়েছিলাম আমি – এখন যে খুব ভালো চলছে তা নয়, তবে আমি এটি সাথে নিয়েই বেঁচে আছি – আত্মসম্মানবোধের সমস্যা, নিজের শারীরিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে সুনির্দিষ্ট ধারণার অজ্ঞতা, সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে গভীর অস্বস্তি সবকিছু বহন করেই চলছি। জানি না আমি এখনও সুস্থ হয়েছি কিনা, তবে আমার "আমি" কে নিজের পাশে রেখে নয় বরং আমার চারপাশের বিশ্বকে পর্যবেক্ষণ করে আমি বেঁচে থাকার মতো বিশ্বাস করতে

শিখেছি অবশ্যই। এবং এই সত্যটি স্বীকার করার মতো শক্তি আমি অর্জন করেছি যে, আমার ক্ষুধা পাওয়া আর না পাওয়া আমি কখনোই বুঝতে পারি না। আমার মেয়ে মারিয়া সোফিয়া, খাবারের সাথে ওর খুব সুসম্পর্ক এবং সে রান্না করতে পছন্দ করে। সে আমার সুস্থ হয়ে উঠার পেছনে মূল ভূমিকা পালন করেছে।

আমার মনে একটা চিন্তা এসেছে। আমার মতো করে আপনিও কি অনুভব করেন যে, এই চিন্তাভাবনা এবং লেখাই মানুষের মনের বন্ধ দরজা খুলতে পারে? হতাশা এবং উদ্বেগের মুহূর্তগুলি থেকে সরে যাবার একটা রুক্ষপথ তৈরি করতে পারে?

জেনি হোলজারের পরামর্শ মতো আমিও মনে করি যে, আমাদের জীবন এখন অন্যের জীবন সম্পর্কে জানতে বেশি আগ্রহী। কাজ মানুষকে ক্ষমতাশীল এবং শক্তিশালী করে। ধীরে ধীরে আমি উপলব্ধি করেছি যে, লেখার সাথে একটি দেহও জড়িত এবং তাই লেখার সময় সেই দেহের মনটিও কাজ করতে সক্ষম হয়। আমি নিজেকে তৈরি করলাম। দৃশ্যগত বস্তুর ভেতর আমি আদর্শ চিত্র খোঁজা বন্ধ করি। আমি আমার ভেতরের ভয়গুলোকে ভালোভাবে নেড়ে ছুঁয়ে দেখেছি। শিল্প ইতিহাসবিদ হিসাবে আমি "ক্যারিয়ার" তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছি। তবে কে জানে, হয়তো সেই ক্যারিয়ারটি গড়তে ব্যর্থ হওয়াটাই আমার জন্য বেশি ভালো হয়েছে।

তবুও আপনি শিল্প ইতিহাসবিদের চোখে লিখেছেন একের পর এক কবিতা। পাঠকরা আপনার কবিতায় ভার্মিরের মতো প্রসারিত সৌন্দর্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছে। আর আপনি শিল্পের কাজের বিবরণ সম্পর্কে একটি চমৎকার ছোট বই উপহার দিয়েছেন আমাদেরকে, La vita dei dettagli, *সেখানে পাঠককে জিয়াত্তো, বোশ, কর্নেল এবং আরও কয়েক ডজন শিল্পীর কাজ সম্পর্কে কিছুটা বিবরণ দেয়া হয়েছে। সেই বইতে মুখোমুখি পৃষ্ঠায় গদ্যের পাঠ, এবং সেই পাঠটির বিষয় সনাক্ত করার আগে কিছু ছবিতে ধাঁধা রাখা আছে পাঠকদের জন্য।*

হ্যাঁ, এলিজাবেথ বিশপ যেমন বলেছিলেন, "কোনও বিবরণ তুচ্ছ নয়।" আমি বিবরণ দ্বারা বেশ আচ্ছন্ন। এটি শিল্প ইতিহাসে আমার শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত। আমি আমার বইটিতে যেমনটি করেছি, তেমনি একটি ছোট ছবি থেকে বৃহৎ ছবির অর্থ উদ্ধারের প্রবণতা আছে আমার ভেতর। বিশাল একটি চিত্রকর্ম আমাদেরকে সুন্দরের ইঙ্গিত দেয়, আমাদের প্রত্যেকে আলাদাভাবে ডাকে। হতো পারে সেটি সেই ছবির ঘটনা কিংবা অন্যকোন বৃহৎ ছবির ইঙ্গিত।

প্রযুক্তির বাইরেও আপনার কবিতাগুলিতে ভিজ্যুয়াল আর্টের স্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। আপনি এর দার্শনিক প্রভাব সম্পর্কে আরও বলতে পারেন?

মার্গারেটের একটি ছবি আছে যার আমি খুব ভক্ত এবং সেই সাথে ছবিটিকে আমি খুব ভয় পাই, তার নাম – The Human Condition । মানুষের জীবনে সবখানে

একটি ফ্রেম থাকে এবং এই ফ্রেমটি হচ্ছে আমাদের ট্রাজেডি। এটি Dal balcone del corpo-র কেন্দ্রীয় উত্থাপন – আমরা কল্পনা করি যে আমাদের আড়ালে কী রয়েছে আমরা সেটা দেখছি। কিন্তু বাস্তবে আমরা কেবল আমাদের চোখের সামনে এবং আবছায়া দৃষ্টিসীমানার ভেতরের বস্তুকেই দেখতে পাই। কিউবিজম হ'ল সেই আন্দোলন যা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণকে দেখতে পাবার স্বপ্ন দেখিয়েছিলো মানুষকে। তবে পরাবাস্তবতা– দুঃস্বপ্নের বাস্তবতা এবং উপলব্ধি সম্পর্কে সত্য বলেছে। এই বিষয়টি আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে, আমরা এমন দর্শক যাঁরা প্রতিনিয়ত নিজেকে আবদ্ধ করে রাখি পরিচিত অভিজ্ঞতার খাঁচায়। আমার লেখা Notti di pace occidentale, কবিতাটি টেলিভিশনে দেখা একটি ঘটনা থেকে লিখেছিলাম। বসনিয়াতে যুদ্ধের সময় আশ্রয়প্রাপ্ত এক নারীকে দেখাচ্ছিল টেলিভিশনে। স্পষ্টতই, আমি সংবাদ প্রতিবেদক না। সেই নারীর কষ্টের কথা ভিডিও করে সবাইকে জানানো সম্ভব না আমার পক্ষে। আমি সেখানে উপস্থিতও ছিলাম না। তাই ভাষাই ছিল আমার একমাত্র হাতিয়ার। আমি লিখে জানিয়েছি সেই নারীর মনের অবস্থা কেমন হতে পারে তখন।

Notti di pace occidentale *বইটি আপনি মধ্যপ্রাচ্যের অন্তহীন যুদ্ধের বিরুদ্ধে লিখেছেন। আপনি কি এই লেখার পর আপনার ভবিষ্যতের লেখায় নতুন মোড় দেখতে পাচ্ছেন?*

ভূগোল এবং ইতিহাস দীর্ঘকাল ধরে আমার লেখায় বিশেষ স্থান দখল করে আছে। Notti di pace occidentale প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধের ছায়ায় লেখা হয়েছিল। এই বইয়ে আপাত সমাপ্ত যুদ্ধ নিয়ে পশ্চিমাদের মনে উদ্বেগের আভাস দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ইউরোপ শান্তিতে নেই বরং উদ্বেগজনক মানসিক যুদ্ধের মধ্যে বসবাস করছে। সুতরাং এই বইয়ের শিরোনামটি আসলে ব্যঙ্গাত্মক।

আপনার প্রায় লেখাতেই আমি দেখেছি, আপনি নিজস্ব ব্যথাগুলোকে লেখায় অন্য চরিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে আমি Historiae-*র দুটি উদাহরণ টানবো। একটি আপনার মায়ের জন্য আপনার অন্ত্যেষ্টি গাথা, যা আমার কাছে বইয়ের কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে হয়েছে। আরেকটি হচ্ছে আপনার দাদা, ১৯১৫ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত তার দুর্দশা নিয়ে লেখা আপনার একটি চলমান কবিতা। এই কবিতা দুটি লেখার পটভূমিকা সম্পর্কে একটু বলবেন?*

আমার মা ও দাদুকে নিয়ে লেখা অন্ত্যেষ্টি গাথাগুলো তুলনামূলকভাবে আত্মজীবনীমূলক। আমি জানি না, মাতৃভাষা আমার লেখার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দিয়েছে কিনা আমাকে। আগেই বলেছি, আমার বাবা-মা দুজনেই সার্ডিনিয়ান এবং আমি সার্ডিনিয়ান সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে উঠেছি। আমার দাদুকে নিয়ে লেখা কবিতাটিতে ১৯১৫ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত স্মৃতিচারণ করেছি আমি। কবিতাটিতে দাদুর কথাই বলতে চেয়েছিলাম। দাদুর স্মৃতির সাথে সেই প্রজন্মের মানুষদের কথা বলতে চেয়েছি যারা, মন্টালের

মতে, যুদ্ধ নিয়ে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে উঠেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমার দাদু তরুণ অফিসার ছিলেন। সৈন্যেরা দাদুকে খুব ভালবাসত কিন্তু আমার দাদু নিয়মের ব্যাপারে খুব কঠোর ছিলেন। নিজের সন্তান মারা যাচ্ছে জেনেও তিনি কাজ থেকে ছুটি চাননি। গল্পটি এখানেই শেষ হয়েছে কিন্তু দাদুর এই নীরবতা, নির্লিপ্ততা, বিচ্ছিন্নতার বাইরে আমি আরেকটি ব্যথা অনুভব করেছিলাম। আমার দাদুর সাতাশ বছরের আরেকটি কন্যা যখন মারা যায়, সেই কষ্ট সহ্য করা খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল তার জন্য। আমার বয়স তখন সাত বছর। দাদু আমাকে আদর করতেন না। তিনি আমাকে কাছে ডাকতে পারতেন না। আমার কাছে দাদুর যুদ্ধ মাঠের বেশ কিছু ছবি আছে। সৈনিক হিসেবে দাদু যখন তালিকাভুক্ত হন, তখন তার বয়স ছিল সতেরো। লোগুডোরেসে লেখা দাদুর কিছু প্রেমের কবিতা আছে আমাদের কাছে, যদিও কবিতাগুলো পড়লে মনে হয় যেন তিনি কখনই কবিতার শব্দগুলিকে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি।

আমার ভাবতে অবাক লাগে, দাদুর মতো এমন আরো কত মানুষ রয়েছে, আরো এমন কত ব্যক্তিগত ত্যাগ রয়েছে বৃহত্তর অর্জনের জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমার দাদু "ভাগ্যবান" ছিলেন, কারণ জার্মানদের হাতে বন্দী হবার পরিবর্তে তাকে ইংরেজরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাই দাদু সম্পর্কে লেখার সময় আমার মাথায় কাজ করেছে যে, দুই কন্যার মৃত্যু দেখার জন্যই হয়তো আমার দাদু দুইটি যুদ্ধে বেঁচে গিয়েছিলেন।

আমার মা, মায়ের সম্পর্কে কথা বলতে খুব ভালো লাগে আমার। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি এমন একটা যুগে জন্মেছিলেন যখন মানসিক অসুস্থতার কোন চিকিৎসা ছিল না। আমি অনেক জায়গায় বলেছি, আমার মা দীর্ঘদিন ধরে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ছিলেন কারণ সেইসময় যক্ষ্মা একটি লজ্জাজনক রোগ হিসাবে বিবেচিত হতো। দুটির অবস্থান আলাদা, একটি শারীরিক, আর একটি সামাজিক, কিন্তু এই দুটি পারস্পরিকভাবে জড়িত ছিল। মা মারা যাবার পর, আমি চেষ্টা করলাম, আমার শোকগাথায় মায়ের শরীর ও মনের ব্যথা এবং বিদ্রোহের একটি কাব্যরূপ দেওয়ার। আমার মা ছিলেন একজন পরিত্যক্ত অভিজাত মানুষ – অবশ্যই আমার মা সাধারণ মনের বুর্জোয়া ছিলেন না। তাই রোমে আমরা খুব বেমানান ছিলাম।

আমাকে সবসময় খুব আকর্ষণ করেছে একটি বিষয়, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবনের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক। Notti di pace occidentale এর শিরোনাম বিভাগে আমি এই বিষয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। ইতিহাসের গল্পগুলি আসলে কী? মানুষের জীবনে কবিতার ভূমিকা কী, আদৌ যদি কিছু থেকে থাকে আরকি? কবিতা কি আমাদেরকে শান্তনা দিতে পারে? আমার তা মনে হয় না। অবশ্যই কবিকে শান্তনা দিতে পারে না কবিতা। তবে সম্ভবত কবিতা লিখে কবি নিজেকে বিরত রাখতে পারে অন্যকোথাও উত্তরের খোঁজে ছোটাছুটি করা থেকে। নিয়তির কাছ থেকে না পালিয়ে বরং তার চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে – এমনকি একটি সনেট লিখেও যথাসাধ্য সেই চেষ্টা করে যায় একজন কবি।

সময়ের সাথে সাথে আপনার লেখার লক্ষ্য কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে? প্রথম বই প্রকাশ এবং মধ্যজীবনে লেখালেখি থেকে আপনি কী আশা করেছিলেন? এবং আপনার পরবর্তী লেখায় কী পরিবর্তন আসছে?

এই প্রশ্নের উত্তর আমি জানি না। কারণ আমি "ক্যারিয়ার" হিসাবে লেখার কথা ভাবতে পারি না। বরং আমার কাছে লেখা হচ্ছে একজন লেখকের জন্য একটি প্রচণ্ড দায়বদ্ধতা। লেখা নিয়ে আমার কোন পরিকল্পনা নেই, কোন গন্তব্য নেই। লেখার প্রতি আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হচ্ছে, "একটি লেখা একসাথে পড়ুন এবং তা একসাথে উপলব্ধি করুন।" সম্ভবত একারণেই আমার সাম্প্রতিক লেখাগুলোর সাথে আমার প্রথমদিকের লেখাগুলোর মিল রয়েছে। গনজাগাসের একটি নীতিবাক্য আমার খুব প্রিয়: "আশা রাখো এবং ভয় মুক্ত থাকো" (Nec spe , nec metu)।

প্যারাবল

মনিরা রহমান

হস্তি দর্শন

শূন্যকায়ার দৃষ্টিশক্তি দিগন্ত প্রসারিই শুধু নয় রাতের আকাশের হাজারো নক্ষত্রের দিনলিপি তার আত্মস্থ। স্বর্গের নদী আকাশগঙ্গায় চোখ রেখে পার করে সে ভাদ্র আশ্বিন। বছর জুড়ে তারায় তারায় হিসেবের খাতায় অন্যের দিনপঞ্জি। ধ্রুব তার ততো প্রিয় নক্ষত্র নয় যতটা প্রিয় কালপুরুষ। ধ্রুব অনড় হয়ে পথ দেখায় নাবিককে। নিজের আবাসে স্থির। নক্ষত্রচক্রে প্রতিদিন আর সব সদস্য একটু একটু সরে যাবার কালে এই ক্ষুদে গ্রহের ধুলিসম মানুষের যাপনে ফেলে যায় কতশত ছাপ্পর। শূন্যকায়ার ভূর্জপত্রের স্তুপ কলেবরে বাড়ে ক্রমশ। ভাগ্যফল বড়ো আজব! সবই লেখা থাকে মহাকালের ভাঁজে!

অন্তরিক্ষ ত্রিমাত্রিক অনুভূতিতে খুব ছাপ ফেলে না, যতটা ফেলে নিজের একরত্তি শরীরের মহিমা। ক্ষুদ্র নয়ন যতদূরেই দৃষ্টি প্রসারিত করুক নিজের পিঠ দর্শনে বরাবরই অক্ষম। পিঁপড়ের খাদ্য অন্বেষণ বা মৌমাছির মৌচাকে জমে ওঠা মধু সম্ভারও পুরোটা দেখা হয়ে ওঠে না। শূন্যকায়ার হাতি নামক পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো প্রাণীটি দেখার দীর্ঘদিন এর নিভৃত ইচ্ছে আছে। আকাশে সিংহ মেষ মীন কাঁকড়া থাকলেও হাতি নেই। কতিপয় অন্ধের হস্তি দর্শন এর গল্পটি সে শৈশব থেকে জানলেও নিজের সেটি দর্শনের অভিজ্ঞতা নেই।

একজন মাহুতও হাতিকে ততটা দেখে না, যতটা সে তার চিকন চাবুকটিকে দেখে। হাতির বিশালাকার মগজকে ভোঁতা করে মানুষের উপযোগী করতে মাহুত অবিরত বাতাসে চাবুক সঞ্চালন করে। প্রত্যক্ষ এক দাসত্বের চিহ্ন কপালে নিয়ে হাতি ভাঁড় সেজে খেলা দেখায় পথে কিংবা সার্কাসের তাবুতে। শূন্যকায়া হাতি দর্শনের সমাপ্তি টানে এই ভেবে যে তার দৃষ্টি অন্ধদের অপেক্ষা জোড়ালো নয়– পুরো হাতিকে আসলে কেউ আজো দেখে উঠতে পারেনি।

মনিরা রহমান

বীজধান

তৃতীয় বারের মতো পুত জন্মানোয় করিমুন্নেছার মনের মধ্যে আকুলিবিকুলি করে একজন মেয়ের জন্য। গাও-গেরামের সকলে জানে তার হাতের ধানের বেছনের খবর। বীজ ধান থেকে চুল্লীতে টগবগে ভাত রাঁধার মধ্যে যে কর্মযজ্ঞ তা গুনতে গেলে কুড়ি ছাড়িয়ে ত্রিশ ছুঁই ছুঁই। তার অধিকাংশই নরম হাতের সুক্ষ্ম কাজ। করিমন সেসব করে পরম মমতায়। বীজধানের কলস শুষ্ক রাখার কৌশল থেকে শুরু করে সারাবাড়িতে ছড়িয়ে পড়া সুবাসিত ভাত রাঁধা সে শিখেছে তার মায়ের কাছে। বীজতলা তৈরি করে সে নিজের উঠোনের লাগোয়া জমিনে। খনা নামে কেও ছিলো, তার কৃষিতে ছিলো জ্যোতিষজ্ঞান ভাসা ভাসা শুনেছিলো, মুখে মুখে ছড়া কাটবার কালে। হয়তো খনার মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলো তার মায়ের ঘরানার আদী কোনো নারী। মাচান জুড়ে তাই নানান ধরনের মটকা আর জালা কোলায় ভরে ওঠে বীজমন্ত্র। তার ভেতরেই শস্যের প্রাণভ্রমরা মৌ মৌ সুবাসে ঘুম যায়। আড়মোড়া ভাঙে। আধুনিক শস্যবীজ পেটেন্ট করা কারবারি পাত্তা পায় না করিমনের বেছনের কাছে।

স্বামী তার ভালো আবাদি। জমিনে চাষ দেয়। বৌয়ের আদরে ফসলের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়। স্বাস্থ্যবান পুতে ঘর ভরে উঠতে দেখে মরদের বুকের পাটা আরো ফুলে ওঠে। ধানের সুবাসে চোখ মুদে আসে। বাস্তু সাপ আর ধানের ঘ্রাণ এক হয়ে মেশে। করিমুন্নেছার মেয়ে চাই। ঢেকিতে পার দেয় সে নাচের ভঙ্গিমায়। আঁটসাঁট গতর ঢেঁকির দোলে দোল খায়। দোলে। কারো ঘরে ঢেঁকি না থাকলেও তার ঢেঁকির ছন্দোময় শব্দ বাতাসের জমাট বেঁধে থাকায় ধাই ধুকুর শব্দে চুর চুর ভাঙে আর আশেপাশের ঘরে ঘরে পৌঁছায়। বাতাসে ধান উড়ানোর কালে তুষ প্রজাপতির প্রাণ পায়, আর চুলায় জ্বলবার কালে হয় প্রাণের ফুলকি। বীজধান থেকে কিছু তুলে নেয় করিমন, সেই চালের ভাতেই ভাতারকে তুষ্ট করবে সে। ফের বছর মেয়ের মায়াময় মুখে চান্দেরশোভা দেখে সুয্যিশোভায় হাসবে খেত। মেয়ে শিখে নেবে ভুঁই আর বীজের মহামিলনের কথা, যা বহু হাজার বছরে ভুলেছে তাদের জাত ভাই। মেয়ের হাতে তুলে দেবে তার বীজধান এর প্রাণ। এক জীবনের ক্ষুদ্র কণায় বহু বহু জীবন বইবে সমুদ্দুর থেকে আসমানে।

মনিরা রহমান

পরিব্রাজক

বেনোজলে নাইলে অসুখ হবে জেনেও বাহামণি তাতেই ডুব দেয় অবিরল। ঘোলা জলে নিজেকে সাময়িক লুকিয়ে ফেলার সুখ নেয় নিঃশ্বাস খানিক বন্ধ রেখে। ডুব সাঁতারে হুস করে ভেসে ওঠে এদিকে ওদিকে। স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে রাখার কৌশল জেনেছে সে চকচকে মীনকন্যাদের কাছে, যারা লোনাজল খাড়ি থেকে ঠেলে আসে উজানে মিষ্টিজলে প্রেমের প্রশান্তি পেতে। বাহামণি যে জনজাতির মানুষ তারা গাংপাড়ে নয় আদ্যিকালে জঙ্গুলে এলাকায় লুকিয়ে থাকতো। এখন সেখানে চাষের জমিন হলেও তারা সেই জমিকে ভগবানের দান বলেই জানে। বাহা কোথাও থিতু হয় না।

জলের পললে বিস্তৃত গাঙের কোথাও চর জমে। ঘাস ঝোপ ইচ্ছেমতো ছেয়ে ফেলে পাললিক ভূমি। বাহামণির কোঁকড়ানো চুলে কাকুইএর ছোঁয়া না পড়াতে তাতেও আটকে যায় পলিমাটির আস্তর। ক্রমে বটের ঝুরির মতো দোল খায় যখন সে কাড়াম ছন্দে হেঁটে যায় আলপথে। তার শরীরে পলিমাটি-ছাতিম ফুলের গন্ধ মিলেমিশে থাকে। পুরুষ মানুষ বাহাকে ছেনাল ভেবে কাছে টানতে চায়। বাহা দূরেও যায় না কাছেও আসেনা। তার অবয়ব জুড়ে মহামায়ার পট দৃশ্যমান হয়। তখন পুরুষ ভয় পায় তাকে। হেঁটে যাবার কালে ঘাস তার পা ছুঁয়ে দেয়। পক্ষীকূল মাথার উপর ওড়াওড়ি করে। শিশুরা তার ঝুড়ির মত চুলে দোল খায় আর সাঁতরানোর কালে মীন পরিবার তাকে সঙ্গ দেয়। শিশু বা মীনশিশু সকলেরই অভয় হয়ে বাহামণি ত্রিলোক ভ্রমণ করে।

রফিক জিবরান

মধুমনতুষি উৎসব

বন্ধু ভাঙাচাঁদ ঘরামীর আগমনে বর্ষার প্রথম ধারার সাথে চলছে মধুমনতুষি উদযাপন– রাতভোর মধুরস পান শেষে একটানা নাচ আর আর গান, চলবে নয় রাত ও দিন, তিয়াশি মনের পিয়াস মেটাতে– প্রথম দিনের উৎসব শুরু হয়েছে চুয়ানির সাথে পূব বাতাসের সুরসঙ্গীতে– ভোরে।

অলক্ষ্যে কিরণের পরশ পেয়ে শিশিরের রঙ মুছে যেতেই টেম্পেস্টের পৃষ্ঠা ছিঁড়ে আরেক বন্ধু ক্যালিবান উড়ে আসে আধাসিকির মাচানে, ফকিরসাধুবাউলদের সঙ্গ পিপাসায়।

'আমারও খোদা আছে; আত্মভোলা, কালোচোখের মায়ায় বাঁধেন তিনি পাখির জবান'– আধাসিকির আলিঙ্গনে বলে ক্যালিবান– 'দূরের কাছে নিরন্তর প্রসারিত এক উপত্যকা আছে– নানান রঙের ভেতরে প্রকাশিত মানুষের কল্পনার পাখি, সুর ও ধ্বনি, সকলেই সেখানে আগুন ও শিশির হয়।'

গানে প্রাণে সুধারসে প্রথম রাতের মধুমনতুষি শেষ হলেও আধাসিকির গিরায়গিরায় আনন্দবিদ্যুতঝলক। প্রতিবেশীরা জানে, আধাসিকির দিনের শুরু রাতের ছায়ায়– কলবের মাচানে, তার স্বপ্নকল্পধামে, যেখানে নিরন্তর এক বহুপথের মোড় আছে।

'আধাসিকির মিহিদানা' সিরিজ

রফিক জিবরান

ভাঙাচাঁদ ঘরামীর পথের মোড়

নতুন জেগে ওঠা চরের পূবকোণে স্ত্রী মমতার কবরে ভাঙাচাঁদ ঘরামীর আসাযাওয়ার নির্জনে একটা সরু ঘাটার রেখা তৈরি হতে থাকে প্রান্তরের সাথে, তার অজ্ঞাতেই। তবে প্রকৃত নামটি হারিয়ে যাওয়ায় ঘরামী পেশার সাথে কিভাবে ভাঙাচাঁদ যুক্ত হলো বর্তমানের কারো পক্ষে তা ঠাহর করা কঠিন, হয়তো কোনো বেপরোয়া গবেষক ভবিষ্যতে উদ্ধার করতে পারেন। তবে মানুষ বড়ই বিচিত্র স্বভাবের, আর কিসে বিশ্বাস জন্মে আর কিসে অবিশ্বাস তার হদিস কেবল পরমের জানা অথবা তিনিও স্বেচ্ছায় নিজেকে অজানায় রাখতে পারেন।

যৌবনে সে ঘরামী ছিল, মমতার বুদ্ধিতে হেকিম হয়ে ওঠে। অবশ্য অনেকে তাকে ভাঙাচাঁদ হারামী বলেও ডাকতো। তবে ঘরামী থেকে হেকিম হয়ে ওঠার ইতিবৃত্তে দুটি ঘটনা জানা যায়:

১. একদা প্রতিবেশীর একটা বাঁজা সজনে গাছ ঘরামীর সাথে হাতের স্পর্শে ফুল দিতে শুরু করে।
২. হাতের তালুতে প্রচন্ড জ্বালাপোড়া হতে থাকলে ঘরামীর এক ফুঁয়ে একজন বালকের যন্ত্রনার লাঘব হয়।

উপরোক্ত লৌকিক বা রহস্যময় ঘটনার পরেও ঘরামী নিজের কোনো কৃতিত্ব গ্রহণে অস্বীকৃত হয় সফলতার প্রতি তার অদৃশ্য বিতৃষ্ণার কারণে। দু'একজন শুনেছে, মধুমনতুষি উৎসবে প্রচুর চুয়ানি পান শেষে মুখ ফসকে বলা কথা– আমি সেই সম্মানের প্রতি থুথু ছিটাই যে সম্মান বাহ্য সফলতার বিচ্ছুরণ থেকে আসে।

তবু মৃত স্ত্রীর কবরে যাওয়াআসার রাস্তাটি ক্রমে দৃষ্টিগোচর হলে নামকরণপ্রিয় মানবেরা পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তরের সাথে মিশে যাওয়া বহুপথি রাস্তাটিকে 'ভাঙাচাঁদ ঘরামীর পথের মোড়' নামে ডাকতে শুরু করে।

'আধাসিকির মিহিদানা' সিরিজ

রফিক জিবরান

মাটিরকুমার

আমরা লিপ্ত থাকি মহাভূতের সাথে, আর ভাবের দ্বারে ঘুরে ঘুরে নির্লিপ্ত হওয়ার সাধনা করি– মন দিয়া ঘর বান্ধি, শরীর দিয়া ভাঙি, আবার শরীরেই ঘরের বসতি করি–

ভাঙাচাঁদ ঘরামীর কথার ঘোরে আধাসিকি মাচানে থিতু হতে পারে না। তপ্ত জৈষ্ঠ্যের দুপুরে সে মাচান ছেড়ে মাঠে যায়, মাটিরকুমারদের সাধনা দর্শনে ঘুরে বেড়ায়। নিজেরে নিয়ে যায় সারি সারি সবুজ চারাদের কাছে– কৃষকের আঙুল থেকে ছড়িয়ে পড়া প্রাণ থেকে প্রাণের পরশে, আইলের পর আইল পার হওয়ার এতেকাফে কেউ একজন ফিসফিস করে বলে– আমরা ভূতের মধ্যে শুয়ে থাকি, নিজেরাও ভূত হই। মিশে গিয়ে আলাদা হই, আবার মিশে যাই।

ভূতগ্রস্ত থেকে কি ভূত তাড়ানো যায়? আধাসিকি ভাবে।

'আধাসিকির মিহিদানা' সিরিজ

রফিক জিবরান

চণ্ডালকুমারী আকাহি হিয়ার সাধনা

আকাহি হিয়া; এক অনিত্যের সাধনা– মহাপ্রাণের রূপরূপান্তরে দোল খেতে খেতে ধানবীজের অন্তরে বসতি গড়া একজন চণ্ডালকুমারী, বিজিত দেবতাদের ভাষ্য থেকে দূরে, মাটিরকুমার; কৃষকের নিখিল চোখের টিয়া।

চণ্ডাল মহামাতা আমআর' নয়শত বছরের ধ্যান থেকে জন্মগ্রহণের কিংবদন্তী এবং মাটির পরম্পরার নদীতে বয়ে চলা শ্রুতি থেকে আকাহি হিয়া পেয়েছে নিষ্ঠা ও নম্রতার পাঠ।

যেমন কৃষকের আঙুলের স্পর্শ থেকে ধ্যানের জমিনে প্রতিস্থাপিত হওয়ার মুহূর্তগুলিতে শত অর্কেস্ট্রার সুর ঝংকৃত হয় সবুজ বিছানা পেরিয়ে আসমানের এক শূন্য থেকে আরেক শূন্যে; বিস্মৃত চণ্ডাল ও মাটিরকুমারদের কীর্তিতে, আকাহি হিয়ার সাধনা তখন ভাষা পায় কৃষকের খুশির ঝিলিকে।

মাটিরকুমারদের সে একান্তে ডাকে – ভোরে, একলা মাঠের নির্জনে রোদবৃষ্টিঝড়ে। প্রেমিক থেকে সাধক, সাধক থেকে প্রেমিকের বোধিচক্রে দাঁড়িয়ে কখনো নগ্ন শরীরে সিক্ত হয়, আগুন খায়, পুড়ে। মহালোকের পালে তারা নাচে; দৃশ্যমান অন্ধত্বের বাইরে।

'আধাসিকির মিহিদানা' সিরিজ

প্রবন্ধ

প্যারাবল: বিন্দুর ভেতরে সিন্ধু দর্শন

মাজহার জীবন

একদল অন্ধ মানুষ শুনতে পেল শহরে অদ্ভুত এক প্রাণি এসেছে। প্রাণিটার নাম হাতি। তারা কেউ-ই হাতির অবয়াবব আর চেহারা সম্পর্কে অবগত ছিল না। কৌতুহলের বসে তারা বলল, "আমরা সবাই হাতিটা স্পর্শ দেখবে এটি কেমন। কারণ অন্ধ হলেও কোনকিছু স্পর্শ করে পরখ করতে আমরা সক্ষম।" তারা সবাই তাই হাতির কাছে গেল। একেকজন হাতির একেক জায়গায় দাঁড়িয়ে স্পর্শ করা শুরু করলো। প্রথম জন হাতির শুঁড় স্পর্শ করে বলল, "হাতি মোটা সাপের মতন দেখতে"। যার হাত কান স্পর্শ করলো সে বলল, এটা দেখতে এক ধরনের হাতপাখার মত। আবার যে হাতির পা ধরতে পারলো সে জানালো, এটি দেখতে গাছের গুড়ির মতো এক ধরনের পিলার। আর যে হাতির একপাশ স্পর্শ করলো সে বলল, "এটি দেখতে প্রাচীরের মতন"। অন্যদিকে যে লেজ ধরার সুযোগ পেল সে বললো, এটি দড়ির মতো। শেষ ব্যক্তি হাতির দাঁত ধরে বললো, এটি শক্ত মসৃণ বল্লমের মতো।

প্রিয় পাঠক উপরের গল্পটা সাহিত্যের ময়দানে প্যারাবলের একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আমরা এ প্রবন্ধে প্যারাবল নিয়ে সাধারণ আলোচনা করবো - দেখার চেষ্টা করবো প্যারাবল কি, এর বৈশিষ্ট, প্যারাবলের সাথে রূপক, উপমা, এলিগোরি ও ফেবলের পার্থক্য, দেশে দেশে প্যারাবলের চর্চা, প্যারাবল চর্চার ভবিষ্যৎ ইত্যাদি।

প্যারাবল কি?

সাহিত্যের ইতিহাসে প্যারাবলের উপস্থিতি প্রাচীন যদিও এটি কখনই একটি আলাদা

শক্তিশালী স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে দাঁড় হয়নি। এর অন্যতম কারণ হতে পারে প্যারাবলের সাথে ধর্মীয় শিক্ষার একটা সম্পর্ক মধ্যযুগ থেকে বিশেষ করে বাইবেলে। আধুনিককালে হোর্হে লুই বোর্হেস, কাফকা, জন হোকস, ডোনাল্ড বার্থহেলম, রবার্ট কোভার, উইলিয়াম এইচ গাস প্রভৃতি শক্তিশালী সাহিত্যিকরা প্যারাবলের চর্চা করায় সাহিত্যের এ শাখাটি আলোচনায় ফিরে এসেছে। এখানে বলে রাখা ভাল, সাহিত্যে কাহিনি বা আখ্যানের জন্ম থেকেই প্যারাবলের চর্চা হয়ে আসছে। ফলে লিখিত সাহিত্য ইতিহাসে রোমান, গ্রিক, চীনা, জাপানী, আফ্রিকান এবং ল্যাতিন আমেরিকান প্রাচীন সাহিত্যে প্যারাবলের চর্চা হয়েছে। ফেবলের মতো প্যারাবলও এক সংস্কৃতি থেকে অন্য সংস্কৃতির মাঝে সেতু বন্ধনের কাজ করেছে। ভারতীয় *অন্ধের হাতি দর্শন* প্যারাবলটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ প্যারাবলটি ভারতীয়, জাপানী, পার্শিয়ান এবং ইউরোপীয় সাহিত্যে দেখা যায়।

প্যারাবল শব্দটি ইংরেজিতে এসেছে গ্রিক শব্দ parabolē; এখানে para অর্থ হলো পাশাপাশি বা নিকটবর্তী আর bolē অর্থ হলো ছোঁড়া বা নিক্ষেপ করা। বৃহত্তর অর্থে প্যারাবল মানে 'তুলনা করা, ব্যাখ্যা করা, প্রতিতুলনা করা'। সংক্ষিপ্ত কল্পকাহিনি বোঝাতে গ্রিক অলঙ্কারশাস্ত্রবিদরা প্যারাবল শব্দটি ব্যবহার করেন। প্যারাবল আসলে এক ধরনের রূপকাশ্রয়ী প্রতিচিত্র (metaphorical analogy)

এ গ্লোসারি অব লিটারারি টার্মস গ্রন্থে প্যারাবলের আলোচনায় বলা হয়েছে, 'প্যারাবল হলো মনুষ্য বিষয়ে খুব সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। এটি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয় যা অব্যক্ত প্রতিতুলনা (analogy) বা সাদৃশ্য, উপমা, তুলনা (parallel) এর মাধ্যমে একটি সাধারণ সূত্র (thesis) বা শিক্ষার সাথে যোগসুত্র তৈরি করে বর্ণনাকারী তার পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয়।'

মার্ক টার্নার মনে করেন, প্যারাবল হলো একটি গল্পের মাধ্যমে আরেকটি গল্প এমনকি আরো অনেক গল্পের উপস্থাপন যা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত দু'ভাবেই হতে পারে। তাঁর মতে প্যারাবল বৃহত্তর অর্থে কেবল সাহিত্য বা শিক্ষা/নীতিবিষয়ক একটি পদ্ধতি না বরং এটি হলো মৌলিক জ্ঞান বা ধারণা সংক্রান্ত নীতি (every level of our experience) যা আমাদের জীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যায় ভূমিকা রাখে এবং যার উপস্থিতি সর্বত্র দেখা যায় - সময় বলা থেকে জটিল সাহিত্য সৃষ্টি পর্যন্ত।

সাহিত্য সমালোচক এক্স জে কেনেডি মনে করেন, প্যারাবল হলো সংক্ষিপ্ত গল্প যা কোনকিছু শিক্ষা দেয় এবং কিছু প্যারাবল হলো এলিগোরি তবে প্যারাবলই এলিগোরি না। আবার *পেঙ্গুইন ডিকশনারি অব লিটারারি টার্মস এন্ড লিটারারি থিওরি* গ্রন্থে বলা হয়েছে, প্যারাবল হলো ছোট ও সাধারণ গল্প যা নৈতিকতার নির্দেশনা দেয় আর যার রয়েছে এলিগোরি আর ফেবলের সাথে সম্পৃক্ততা।

জন রাইট মনে করেন, প্যারাবল আংশিক ব্যঙ্গত্মক (satiric), বিদ্রুপাত্মক-ইউটোপিয়ান বিজ্ঞান-ফিকশন (mock-utopian science-fiction) জাতীয় গল্পের মতন এবং নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতায় এটি ব্যঙ্গতাযুক্ত (sardonic), পাণ্ডিত্যপূর্ণ গল্প। বেন বেলিটের মনে করেন, প্যারাবল হলো হেঁয়ালীপূর্ণ প্রচারের (enigmatic preachment) সাধারণ প্রক্রিয়া।

প্যারাবল আর ফেবল মানুষ মুখে মুখে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহন করে নিয়ে এসেছে যা আসলে সাহিত্যের লিখিত রূপের আগ থেকে চলে এসেছে। ফলে এতে লোকজজ্ঞানের উপাদান পাওয়া যায়। প্যারাবল সমাজজীবন বিশ্লেষণে মনোযোগী নয় বরং পাঠক বা শ্রোতাকে তার বিশ্বাস স্মরণ করিয়ে দেয়। প্যারাবলে গল্প বলার চেয়ে মানুষের আচরণের ঘটনাবলী তুলে ধরায় আগ্রহী। প্যারাবলের পাঠক বা শ্রোতা এটা শুনে মনে করে যে, এটা তো তাদের জনপদেরই গল্প, এটা তো জানাই ছিল, আবার তা মনে পড়ে গেল।

তাহলে বলা যায়, প্যারাবল হলো সংক্ষিপ্ত গদ্যে কিংবা পদ্যে লিখিত শিক্ষামূলক কল্পকাহিনি যার ভেতর এক বা একাধিক নির্দেশনামূলক শিক্ষা বা নীতি কিংবা তত্ত্বের সন্নিবেশ থাকে।

প্যারাবলের বৈশিষ্ট

আগেই আমরা ধারনা পেয়েছি যে, প্যারাবল হলো ছোট পরিসরে একটা গল্প যা সার্বজনীন কোন সত্যকে প্রকাশ করে। ফলে বর্ণিত আখ্যানে সার্বজনীনতা থাকে। আর এ গল্পের বর্ণনা হয় অতি সাদাসিধে। এর একটা ঘটনা থাকে, ঘটনায় একশন আর তার ফলাফল থাকে। প্যারাবলে অনেক সময় বর্ণিত চরিত্র এক ধরনের নৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে আবার কখন চরিত্র বাজে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে এবং তার জন্য তাকে অনভিপ্রেত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। যদিও প্যারাবলে বর্ণিত গল্পের অর্থ সরাসরি বোঝা যায় না। তবে তা আবার ইচ্ছে করে গোপনও রাখে না বরং সহজেই তা বোঝা যায়।

প্যারাবলের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো এটি পাঠ করে একজন পাঠক বুঝতে পারে, ব্যক্তির কী ধরনের আচরণ করা উচিত বা আচরণ কী হওয়া উচিত। ব্যক্তির জীবনে সঠিক আচরণের নিদের্শনা ও পরামর্শের পাশাপাশি প্যারাবলে সাধারণভাবে রূপক ভাষায় কঠিন ও জটিল ধারনা/তত্ত্বের উপস্থাপন করা হয়, যাতে মানুষ তা সহজে বুঝতে পারে। তাই প্যারাবল সুনির্দিষ্ট মূর্ত ঘটনা বর্ণনা করে যার মাধ্যমে বিমূর্ত যুক্তি পাঠক সহজে বুঝতে পারে। এতে একটা নীতি এবং একটা নৈতিকতায় কেন্দ্রীভূত থাকে এবং পাঠক তা নিজের জীবনে উপলব্ধি করতে পারে।

উইলিয়াম জি ডোটি প্যারাবলের নয়টি বৈশিষ্টের কথা বলেছেন। এগুলো হলো:

ইহজাগতিকতা (এমনকি ধর্মীয় প্যারাবলেও), বিপরীতমুখী পরিবর্তন, রসবোধ, ঐতিহ্যের পুনমূল্যায়ন, সার্বজনীনতা, প্রায়োগিকতা, বর্ণনার জগত যেখানে রহস্য - প্যারাডক্স ও ধাঁধাঁ এবং চরিত্র, চরিত্রায়ন ও তার ভূমিকা।

বাইবেল অনেকগুলো প্যারাবল রয়েছে। এ সকল প্যারাবলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য যেগুলোর অনেকটাই অন্যান্য প্যারাবলেও দেখা যায়:

- এগুলো সংক্ষিপ্ত। অপ্রয়োজনীয় কোন শব্দের ব্যবহার নাই এগুলোতে। যতটা সম্ভব সরাসরি বক্তব্য।
- এর অন্যতম বৈশিষ্ট সরলতা এবং বিষয় উপস্থাপনে এককেন্দ্রীকতা (symmetry)। কোন প্যারাবলেই কোন পরিস্থিতি বর্ণনায় দুই গ্রুপ বা ব্যক্তির ব্যক্তির অধিক উপস্থিতি দেখা যায় না।
- প্যারাবলগুলোর মূল ফোকাস বা বিষয়বস্তু মানুষ। এখানে প্রকৃতি, প্রাণি বা ঈশ্বর বিষয় বর্ণনা নাই।
- প্যারাবলগুলোতে প্রতিদিনের জীবনের ঘটনার কল্পকাহিনির বর্ণনা। ফলে পাঠক/ শ্রোতা সহজে নিজের জীবনোর সাথে তা সম্পৃক্ত করতে পারে।
- প্যারাবলগুলো পাঠককে ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে তুলতে পারে। পাঠক প্যারাবলের সাথে একাত্মতা বোধ করে।
- গল্পের শেষে চমক থাকে যাকে পাঞ্চ লাইন বলা যেতে পারে।
- প্যাবাবলে সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট থাকে।
- প্যারাবলগুলো মানুষের আচরণ পরিবর্তন ও শৃঙ্খলা আনতে ভূমিকা রাখে

প্যারাবল, ফেবল ও এলিগরি, রূপক ও উপমা

আগেই বলা হয়েছে, প্যারাবলের প্লটে মানুষ হলো উপজীব্য আর ঠিক তার উল্টো হলো ফিবল। ফেবলের সাথে এর মূল পার্থক্য হলো, ফেবলের চরিত্ররা বস্তু, প্রাণি, প্রকৃতিক শক্তি কিংবা জীব জগত। এই পার্থক্যটুকু বাদে ফেবলের সাথে প্যারাবলের সাযুজ্জ্বই বেশি।

এলিগরি হলো রূপকাশ্রয়ী কল্পিত ন্যারেটিভ যার ভেতর বর্ণনা করা ঘটনার বাইরে অর্থ বিদ্যমান থাকে। এলিগরির প্রচলিত সাধারণ ফর্ম হলো ফেবল, প্যারাবল এবং এপিলগ যার মধ্যে দুই বা তার অধিক অর্থ লুকানো থাকে যা পাঠককে ব্যাখ্যা প্রক্রিয়ার (interpretive process) মাধ্যমে তার অর্থ বুঝতে হয়। এলিগরি ছোট বড় নানা রকমের হতে পারে। ফলে অধিকাংশ ফেবল ও প্যারাবলই আসলে সেই অর্থে একেকটা এলিগোরি।

প্যারাবলের সাথে ভাষালঙ্কারের সম্পর্ক রয়েছে বিশেষ করে রূপক (metaphor) এবং উপমা (simile) কিন্তু এ দুটোর সাথে প্যারাবলকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। প্যারাবল রূপকের মতো যা বিমূর্ত ধারণা মূর্ত করে প্রকাশ করার জন্য বাস্তব

এবং উপলব্ধি করা যায় এমন বিষয়ের ব্যবহার করা হয়। তাই বলা যেতে পারে যে, প্যারাবল হলো এমন এক রূপক যা বর্ধিত হয় এক সংক্ষিপ্ত এবং সুসংগত ন্যারেটিভের মাধ্যমে। আবার প্যারাবল উপমার সাথেও সাদৃশ্য যা রূপকের মাধ্যমে তুলনা করে। তবে, প্যারাবলের অর্থ অন্তর্নিহিতি থাকে যদিও তা বোধগম্যের বাইরে না।

বাংলা সাহিত্যে প্যারাবল

সংস্কৃতে লেখা ভারতীয় সাহিত্যে *পঞ্চতন্ত্র* একটি উল্লেখযোগ্য ফেবল। *পঞ্চতন্ত্র* আর ঈশপের ফেবল বাংলায় অনেক আগেই অনূদিত হয়েছে। এবং এ গ্রন্থ দুটোর গল্পগুলো বাংলা সাহিত্যের সাথে এতটাই সম্পৃক্ত যে, এগুলোকে আর অনূদিত সাহিত্য বলে মনে হয় না। আবার *মহাভারত* যেহেতু প্যারাবলের আদি উৎসের একটি, তাই বাংলা সাহিত্যে এর উপস্থিতি প্রাচীনকাল থেকেই বলা যায়। তবে এটা বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে ফেবল বা প্যারাবলের তেমন বিকাশ হয়নি। গ্রামে মা, দাদি, নানীরা যে জীবজন্তু বা মানুষের গল্প শিশুদের শোনাতেন সেগুলোই আসলে এ অঞ্চলের ফেবল আর প্যারাবল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যেগুলোর চরিত্র মানবকূল সেগুলোই প্যারাবল। ফলে দেখা যাচ্ছে, বাংলা ভাষার ফেবল ও প্যারাবলের আদি উৎস লোকমুখে প্রচলিত কল্পকাহিনি। এগুলোই যুগে যুগে ওরাল ট্রাডিশনের মাধ্যমে মানুষ প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম বহন করে এনেছে। ৮০০- ১২০০ সালের মধ্যে কোন এক সময় জন্মানো খনা বাংলা সাহিত্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। খনার অনেকগুলো বচন এখনো প্রচলিত আছে। এই খনার বচনের অনেকগুলোর মধ্যে ফেবল ও প্যাবাবলের উপাদান দেখা যায়। আধুনককালে বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সুকুমার রায়ের লেখায় প্যারাবল ও ফেবলের দেখা পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাখের *কনিকা* কাব্যের অধিকাংশ কবিতাই ফেবল পর্যায়ে পড়ে। আর *দুই বিঘা জমি* কিংবা *সোনার তরী* কবিতাকে কেউ যদি প্যারাবল বলে দাবী করে তবে তা অস্বীকার করা কঠিন হয়ে যাবে।

প্যারাবলের সকল বৈশিষ্ট হাজির না থাকলেও আমরা চর্যাপদের অনেকগুলো পদে দেখি গল্পের ছলে নৈতিক শিক্ষার দেয়া হয়েছে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ সংকলিত ৫০টি চর্যাপদে অন্তত গোটা দশেক পদের বর্ণনায় এক ধরনের ন্যারেটিভের আভাস পাওয়া যায়। এছাড়া, কয়েকটিতে ফেবলেরও উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। আমরা জানি, চর্যাপদ হলো বাংলাভাষার অন্যতম প্রাচীন সাহিত্য যা বৌদ্ধতান্ত্রিকদের রহস্যময় গান ও দোহা যেগুলো অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকে রচিত হয়েছিল। এখানে বিরুবাপাদানামের একটি পদের ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ কৃত আধুনিক রূপ পাঠকের জন্য দেয়া হলো। বিরুয়ার জন্ম ত্রিপুরায়। সম্ভবত দেবপালের রাজত্বকালে (৮১০-৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ) তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি কিছুদিন পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারে কাটিয়েছিলেন।

এক সে শুঁড়িনী (নারী মদবিক্রেতা) দুই ঘরে সেঁধয় (প্রবেশ করে)

চিকন বাকলে বারুণী (মদ) বাঁধে।।

সহজ দ্বারা স্থির করিয়া বারুণী চোলাই কর্
যাহাতে অজরামর (মৃত্যু ও জরা) দৃঢ় হয় কাঁধ (দেহ)।।

দশম দোরে চিহ্ন দেখিয়া
এল গ্রাহক আপনি (কিংবা হাটে) (পথ) বহিয়া।।

চৌষট্রি ঘটীতে (সাজাইয়া) দিউক পসার
পশিল গ্রাহক, নাহি নিঃসরণ।।

এক ছোট ঘটী, সরু নল,
ভণেন বিরুয়া থির করিয়া চাল্ ।।

নিচে বনফুলের *নিমগাছ* গল্পটি দেয়ার লোভ সামলানো গেল না। পাঠকই বিচার করবেন এটি প্যারাবল কি না।

কেউ ছালটা ছাড়িয়ে নিয়ে সিদ্ধ করছে।

পাতাগুলো ছিঁড়ে শিলে পিষছে কেউ।

কেউ বা ভাজছে গরম তেলে।

খোস দাদ হাজা চুলকুনিতে লাগাবে।

চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কচি পাতাগুলো খায়ও অনেকে।

এমনি কাঁচাই.....

কিংবা ভেজে বেগুন- সহযোগে।

যকৃতের পক্ষে ভারী উপকার।

কচি ডালগুলো ভেঙে চিবোয় কত লোক...। দাঁত ভালো থাকে। কবিরাজরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

বাড়ির পাশে গজালে বিজ্ঞরা খুশি হন।

বলেন- নিমের হাওয়া ভাল, থাক, কেটো না।

কাটে না, কিন্তু যত্নও করে না।

আবর্জনা জমে এসে চারিদিকে।

শান দিয়ে বাঁধিয়েও দেয় কেউ- সে আর এক আবর্জনা।

হঠাৎ একদিন একটা নূতন ধরনের লোক এলো।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নিমগাছের দিকে। ছাল তুললে না, পাতা ছিঁড়লে না, ডাল ভাঙ্গলে না। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

বলে উঠলো, বাঃ কি সুন্দর পাতাগুলো.....কি রূপ। থোকা থোকা ফুলেরই বা কি বাহার....এক ঝাঁক নক্ষত্র নেমে এসেছে যেন নীল আকাশ থেকে সবুজ সায়রে। বাঃ!

খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে চলে গেল।

কবিরাজ নয়, কবি।

নিমগাছটার ইচ্ছে করতে লাগল লোকটার সঙ্গে চলে যায়। কিন্তু পারলে না। মাটির ভেতর শিকড় অনেক দূরে চলে গেছে। বাড়ির পিছনে আবর্জনার স্তুপের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল সে।

ওদের বাড়ীর গৃহকর্ম-নিপুণা লক্ষ্মী বউটার ঠিক এই দশা।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬-৮৬) তাঁর ভক্তদের প্যারাবলের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষা দিতেন। ভক্তদের বলা তাঁর একটা বিখ্যাত প্যারাবল এরকম:

আকবর আর ফকির

সম্রাট আকবরের শাসনামলে দিল্লির নিকটে এক বনে এক ফকির (মুসলিম সাধু) বাস করতেন। এই ফকিরের কাছে অনেকে আসতেন। তবে তাদের খেদমত করার মতো তার কিছুই ছিল না। এ জন্য তার অর্থের প্রয়োজন হয়ে পড়লো। এবং তিনি তা পেতে দয়ালুখ্যাত আকবর বাদশার কাছে গেলেন।

আকবর যখন মোনাজাত করছিলেন সেই ফকির তখন সেখানে ছিলেন। ফকির আকবরের মোনাজাত শুনতে পেলেন, " হে আল্লাহ, আমাকে আরো সম্পদ দাও, আরো ক্ষমতা দাও, আরো রাজ্য দাও।"

এ মোনাজাত শুনে ফকির প্রস্থান করার জন্য উদ্যত হলেন কিন্তু আকবর তাকে বসতে বললেন। আকবর বললেন, " জনাব আপনি আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছেন। এটা কেমন কথা যে আপনি কিছু না বলেই চলে যাচ্ছেন।"

তখন ফকির বললো, " আলমপানা, আমি যে উদ্দেশ্যে আপনার কাছে এসেছি তার আর আপনাকে বলার দরকার নাই। "

তখন আকবর বারবার জানতে চাইলেন তিনি কি চান, ফকির অবশেষে বললেন, " আলমপানা, অনেকে আমার কাছে শিখতে আসে। কিন্তু অর্থের অভাবে আমি তাদের আতিথেয়তা করতে পারি না। আমার ধারনা ছিল এ সমস্যার সমাধান আপনি করতে পারবেন।"

এরপর আকবর জানতে চাইলেন তাহলে তিনি এটা না জানিয়ে চলে যেতে চাচ্ছিলেন কেন।

এর উত্তরে ফকির বললেন, " যে নিজে একজন ভিক্ষুক তার কাছে আমি কীভাবে ভিক্ষা চাই? তার চেয়ে আমি সরাসরি আল্লার কাছেই ভিক্ষা চাইবো। অবশ্য আমার ভিক্ষা না চেয়ে যদি আর কোন উপায় না থাকে।"

শামসুর রাহমান *প্যারাবল* নামেই একটি কবিতা লিখেছেন:

নাড়েন সবল হাত ছুটে আসে নফরের দল
তড়িঘড়ি চতুঃসীমা থেকে। তাঁর প্রবল নির্দেশে
সমুদ্রে জাহাজ ভাসে, অবিরাম চাকা ঘোরে কল-
কারখানায়, তৈরি হয় সেতু দিকে দিকে; দেশে দেশে
নিমেষে জমান পাড়ি রাষ্ট্রদুতগণ, কারাগারে
জমে ভিড়, সৈন্য বাড়ে রাতারাতি, কানায় কানায়
ভ'রে ওঠে অস্ত্রাগার, এমন কি আগাড়ে ভাগাড়ে
শকুনের বসে ভোজ। কিন্তু ছোট কোমল ডানায়।

ভর ক'রে পাখি আসে ডালে তাঁর নির্দেশ ছাড়াই-
বিখ্যাত কোকিল। ডাকে অন্তরালে, নির্ভীক স্বাধীন।
হঠাৎ বলেন তিনি, 'পাখিটাকে কী ক'রে তাড়াই?
থামা তোর গান, নইলে দেবো শাস্তি ওরে অর্বাচীন।
তবু সুর আসে ভেসে। কোকিল নয়কো কারো দাস,
কখনো পারে না তাকে স্তব্ধ করতে কোনো সর্বনাশ।

ইহুদি ধর্মশাস্ত্রে প্যারাবল

প্যারাবলের মাধ্যমে যেহেতু মানুষকে সহজে কঠিন ও জটিল বিষয়ে সম্পর্কে বোঝানো সম্ভব হয় তাই এক্ষেত্রে ইহুদি ধর্মের টেক্সটেও এর ব্যবহার দেখা যায়। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে রাব্বিরা (ইহুদি ধর্মপ্রচারক) প্যারাবলকে একটা উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং ঈশ্বরের আইনের সঠিক অর্থ বোঝাতে তারা এর ব্যবহার করেছেন। তাদের ধর্মশাস্ত্র তালমুদ এবং মিডরাশ এ অনেক প্যারাবল রয়েছে। পাঠকদের জন্য এর মধ্যে থেকে একটি প্যারাবল তুলে দেয়া হলো:

পৌত্তলিক ধর্মে বিশ্বাসী এক দার্শনিক একবার আর. গামালিয়েলকে জিজ্ঞাসা করলো, ঈশ্বর কেন মূর্তির উপর না রেগে মূর্তি পূজারীর উপর রাগান্বিত হন। গামালিয়েল দার্শনিকের এ প্রশ্নের উত্তর করলেন এই প্যারাবলটা বলে। এক রাজার এক ছেলে ছিল। ছেলেটা একটা কুকুর পুষলো এবং কুকুরটার নাম তার রাজকীয় পিতার নামেই রাখলো। যখনই সে কসম করে তখনই সে বলে, "কুকুরের জীবনের কসম, পিতা।" রাজা এটা যখন শুনলেন, তখন তার রাগ কার প্রতি হবে, সন্তানের প্রতি না কুকুরের প্রতি? অবশ্যই সন্তানের প্রতি। (আব জারাহ ৫৪বি)

বাইবেলে প্যারাবল

বাইবেলে প্যারাবলের ব্যবহারের কারণে ইউরোপের ধর্ম ও সাহিত্য জগতে প্যারাবল অতি পরিচিত নাম। ধর্মযাজকেরা এর প্রচারের ফলে ব্যাপারটা এমন হয়ে যায় যে, প্যারাবল যেন কেবল বাইবেলেরই ব্যাপারস্যাপার। বাইবেলের নিউটেস্টামেন্টে লুকের গসপেলে ২৪টি যার মধ্যে ১৮টি স্বতন্ত্র, ম্যাথু এর গসপেলে ২৩টি যার মধ্যে ১১টি স্বতন্ত্র আর মার্কের গসপেলে ৮টি যার মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র প্যারাবল। যিশু মূলত তার বাণী সহজভাবে জনতাকে বোঝাতে এসব প্যারাবল ব্যবহার করতেন। নিচে বাইবেল থেকে একটি প্যারাবল:

ভালো শমরীয়ের কাহিনী

একদিন, ইহুদি ব্যবস্থার নিপুণ এক গুরু এলেন যীশুকে পরীক্ষা করতে, বললেন, "গুরু, অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে?" যীশু উত্তর দিলেন, "ঈশ্বরের বাক্যে কি লেখা আছে?"

ব্যবস্থার নিপুণ গুরু উত্তর দিলেন, " তোমার প্রভু ঈশ্বরকে তোমার সম্পূর্ণ হৃদয়, প্রাণ, শক্তি, আর মন দিয়ে প্রেম কর। আর তোমার প্রতিবেশীকে নিজের সমান প্রেম কর।" যীশু উত্তর দিলেন, "তুমি সঠিক বলেছ! এমনটাই কর আর তুমি বাঁচবে।"

কিন্তু সেই ধর্মগুরু প্রমাণ করতে চাইলেন যে তিনি ধার্মিক, তাই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার প্রতিবেশী কে?"

ব্যবস্থার-গুরুকে যীশু এক দ্রষ্টান্ত দ্বারা উত্তর দিলেন। "এক ইহুদি ব্যক্তি ছিলেন যিনি জেরুজালেমের রাস্তা দিয়ে যিরীহোতে যাচ্ছিলেন।"

যখন সেই ব্যক্তি যাত্রা করছিলেন তখন একদল ডাকাত তাকে আক্রমণ করে।

যা কিছু তার কাছে ছিল তারা তা লুট করল আর প্রায় আধমরা অবস্থা পর্যন্ত পেটালো। তারপর তারা সেখান থেকে চলে গেল।"

"তার পর পরই, এক ইহুদি যাজক সেই পথ দিয়ে আসছিলেন। যখন সেই ধার্মিক-নেতা সেই ডাকাত আক্রান্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিটিকে দেখলেন, তখন তিনি রাস্তার অন্য ধার দিয়ে চলে গেলেন, সেই সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিটিকে উপেক্ষা করলেন আর চলতেই থাকলেন।

"আরও কিছু সময় পর, এক লেবীয় সেই পথ দিয়ে এলেন। (লেবীয়রা হলেন ইহুদিদের একটি গোত্র যারা মন্দিরে যাজকদের সাহায্য করতেন।) সেই লেবীয়টিও রাস্তার অন্য ধার দিয়ে চলে গেলেন, সেই ডাকাত আক্রান্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিটিকে উপেক্ষা করে।

" এর পর যে ব্যক্তি সেই পথ দিয়ে এলেন সে হল একজন শমরীয়। (শমরীয় হল ইহুদিদেরই বংশের লোক যারা অন্য রাষ্ট্রের মানুষদের বিবাহ করেছিল। শমরীয়রা আর ইহুদিরা একে অপরকে ঘৃণা করত।) কিন্তু যখন সেই শমরীয় সেই ইহুদিকে দেখলেন তখন তিনি তার প্রতি খুবই সহানুভূতি অনুভব করলেন। তাই তিনি তার যত্ন নিলেন আর তার ক্ষত বেঁধে দিলেন। "

" শমরীয় সেই ব্যক্তিটিকে নিজের গাধার উপর চড়ালেন আর তাকে এক সরাই খানায় নিয়ে এলেন যেখানে তিনি তার যত্ন নিলেন।"

" পরের দিন, সেই শমরীয়কে তার যাত্রা পুনরায় বহাল করতে হলো। তাই তিনি সরাইখানার মালিককে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, 'ইহুদি ব্যক্তিটির সেবা-যত্ন করবেন, আর যদি আপনি বেশি টাকা তার জন্য খরচা করে থাকেন তাহলে যখন আমি এই পথ দিয়ে ফিরব তখন আমি তা শোধ করে দেব।'চ

তখন যীশু সেই ধর্মগুরুকে প্রশ্ন করেন, " আপনি কি মনে করেন? সেই তিন ব্যক্তির মধ্যে কে সেই ডাকাত আক্রান্ত ও আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিটির প্রতিবেশী?" তিনি উত্তর দিলেন, " সেই ব্যক্তি যিনি তার উপর দয়াশীল ছিল।" যীশু উত্তর দিলেন, "তুমিও যাও আর একই রকম কর। " (লুক ১০:২৫-৩৭)

ইসলামে প্যারাবল

প্যারাবল ব্যবহারের মাধ্যমে যেহেতু সহজে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা মানুষকে সহজে বোঝানো যায়, তাই ইসলাম ধর্ম প্রচারে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। নবীর রাস্তায়

বুড়ির কাঁটা বিছানোর গল্পটি ইসলাম ধর্মে একটি উৎকৃষ্ট প্যারাবল। এমনকি কোরানেও প্যারাবলের উপস্থিতি রয়েছে। যেমন সুরা বাকারা, আয়াত ২৫৯ এ বর্ণনা করা হয়েছে:

> অথবা সে ব্যক্তির মত, যে এমন এক জনমত অতিক্রম করেছিল যা তার ছাদের উপর থেকে বিধ্বস্ত ছিল। সে বলল, 'মৃত্যুর পর কিভাবে আল্লাহ্ একে জীবিত করবেন? তারপর আল্লাহ্ একে শত বছর মৃত রাখলেন। পরে তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ্ বললেন, 'তুমি কতকাল অবস্থান করলে?' সে বলল, 'একদিন বা একদিনেরও কিছু কম অবস্থান করেছি। তিনি বললেন, বরং তুমি একশত বছর অবস্থান করেছ। সুতরাং তুমি তোমার খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় বস্তুর দিকে লক্ষ্য কর, সেগুলো অবিকৃত রয়েছে এবং লক্ষ্য কর তোমার গাধাটির দিকে। আর যাতে আমরা তোমাকে বানাবো মানুষের জন্য নিদর্শন স্বরূপ। আর অস্থিগুলোর দিকে লক্ষ করো; কীভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই।' অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হল তখন সে বলল, 'আমি জানি নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান'।

হাদিসেও প্যারাবলের ব্যবহার খুবই স্বাভাবিক। যেমন তিরমিজি শরীফের ৫ম খণ্ডের ৪৩ অধ্যায়ের ২৮৬২ নম্বর হাদিসটি এরূপ:

> জাবির বিন আব্দুল্লআহ কর্তৃক বর্ণিত: আল্লার নবী বলেছেন: আমার নিজের প্যারাবল (জীবনকাহিনি) এবং আমার আগের নবীদের প্যারাবল হলো এমন যে, যেন একজন মানুষ একটা বাড়ি তৈরি করেছে। তিনি সেটার নির্মাণ সম্পন্ন করেছেন এবং তা সুন্দরভাবে তা করেছেন। তবে বাড়িটার একটা একটা ইট কেবল ফাঁকা রেখেছেন। মানুষজন বাড়িটিতে প্রবেশ করে আর বলে, " এই ইট পরিমাণ জায়গা যদি ফাঁকা না থাকতো!"

ইসলামের সুফি ট্রাডিশনে প্যারাবলের খুবই ব্যবহার হয়। তবে এর চর্চা বিশেষভাবে দেখা যায় ফার্সি সাহিত্যে যেমন আত্তার, জালালুদ্দিন রুমি, শেখ সাদি, মনসুর হাল্লাজ প্রভৃতি সুফি সাধকদের প্রচারকর্মে প্যারাবলের উপস্থিতি প্রবল। সুফিবাদের শিক্ষা এবং মূল্যবোধ বোঝাতে এটির ব্যবহার হয় যেমনটি দেখা যায় বাউলদের ক্ষেত্রে। বাউল সাধকরা জ্ঞান মার্গের চর্চা করেন জীবনমুখী নানা উদাহরণের মাধ্যমে যার অনেকগুলি একধরনের প্যারাবল। সুফি ঘরানার প্যারাবলকে জনপ্রিয় করতে গবেষক ইদরিশ শাহ এবং অ্যান্থনী ডি ম্যালো ভূমিকা রেখেছেন। নিচে একটি এ ঘরানার *ঋণ শোধ* নামে একটা প্যারাবল দেয়া হলো:

> এক হোজ্জা (শিক্ষক) বাজারে জলপাই বিক্রি করছিলেন। সেদিন বাজারে বেচাবিক্রি ভাল ছিল না। তার পাশ দিয়ে এক নারী যাচ্ছিল। তিনি তাকে ডাকলেন। এবং তাকে জলপাই কেনার জন্য অনুরোধ করলেন। নারীটি মাথা নেড়ে জানালেন তার কাছে কোন টাকা নাই।
>
> " কোন অসুবিধা নাই", হোজ্জা দাঁত বের করে বললো, " আপনি আমাকে

পরে দাম মিটিয়ে দিয়েন।" সে তখন দোনোমনা করছিল। এই দেখে তিনি তাকে একটা চেখে দেখার জন্য বললেন।

" আরে না না, খেতে পারবো না। আমি রোজা আছি।," নারী উত্তর করলেন।

" রোজা? রমজান মাস তো ছয় মাস আগে পার হয়ে গেছে!"

" তা ঠিক। আমি একটা রোজা করতে পারিনি। আজ সেটা করছি। আচ্ছা ঠিক আছে। এক কেজি কাল জলপাই দিন। "

" থামুন!" চিৎকার করে উঠলেন হোজা, " যার আল্লার পাওনা ঋণ শোধ করতে ছয় মাস লাগে, আমার ঋণ শোধ করতে না জানি তার কতমাস লাগবে।"

শেখ সাদি বড় মাপের সুফি সাধক ছিলেন। তার *পোশাকের গুণ* বাঙালী পাঠকের কাছে খুবই পরিচিত। গল্পটি এরকম:

শেখ শাদি খুবই সাদা-সিধে জীবনযাপন করতেন। একবার এক দাওয়াতে তিনি তার সাধারণ পোশাক পরে গেলেন। ফলে দাওয়াকারী তাকে চিনতে পারলেন না। তাকে ফকির ভেবে কম ও অনুন্নত খাবার খেতে দিলেন। তিনি বিষয়টি বুঝতে পারলেন। তখন তিনি সে খাবার খেয়ে ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পর আবার ভালো ও শাহেনশাহী পোশাক পরে ঐ বাড়িতে গেলেন। এবার তার সামনে সকল উন্নত খাবারদাবার এবং তাকে খুব যত্নআত্মি করা হলো। তিনি খাবার খেতে বসে কিছু খেলেন এবং কিছু খাবার তার পোশাকে ঢুকাতে লাগলেন। এই অবস্থা দেখে তাকে প্রশ্ন করা হলো, জনাব আপনি এটা কি করছেন ? জবাবে শেখ শাদি বললেন, একটু আগে আমি এসেছিলাম, আমি সাধারণ পোশাক পরেছিলাম। তখন আপনারা আমাকে সম্মান দেখাননি। অথচ এখন দেখাচ্ছেন। তাই ভাবলাম এই সম্মান ও খাবার আমার নয়, ওগুলোর প্রাপ্য এই পোশাকেরই।

এছাড়া শেখ সাদির আরেকটি প্যারাবল সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত *উত্তম ও অধম* নামে অনুবাদ করেছে যা পাঠকপ্রিয়তা আজও রয়েছে।

কুকুর আসিয়া এমন কামড়
দিল পথিকের পায়
কামড়ের চোটে বিষদাঁত ফুটে
বিষ লেগে গেল তায়।

ঘরে ফিরে এসে রাত্রে বেচারা

বিষম ব্যথায় জাগে,
মেয়েটি তাহার তারি সাথে হায়
জাগে শিয়রের আগে।

বাপেও সে বলে ভর্ৎসনা-ছলে
কপালে রাখিয়া হাত,
"তুমি কেন বাবা, ছেড়ে দিলে তারে
তোমার কি নেই দাঁত!"

কষ্টে হাসিয়া আর্ত কহিল
" তুই রে হাসালি মোরে,
দাঁত আছে বলে কুকুরের পায়
দংশি কেমন করে!

কুকুরের কাজ কুকুর করেছে
কামড় দিয়েছে পায়,
তা ব'লে কুকুরে কামড়ানো কি রে
মানুষের শোভা পায়?"

বৌদ্ধধর্মে প্যারাবল

বৌদ্ধদের ধর্মীয় নিদের্শনাবলী বোঝানোর জন্য ফেবলের প্রচলন রয়েছে। বুদ্ধের জন্মকাহিনি, *জাতক*, এ ফেবলের ব্যবহার করে নৈতিক শিক্ষা প্রচার করা হয়েছে। তাদের একটি ধারা যা জেন নামে পরিচিত। এদের দার্শনিক ও শিক্ষামূলক বিষয়গুলো ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে বোঝানো হয় যার অনেকগুলিই প্যারাবল। নিচে *কঠিন পরিশ্রম* নামে একটি জেন প্যারাবল দেয়া হলো:

> মার্শাল আর্টের একজন ছাত্র তার শিক্ষকের কাছে আগ্রহের সাথে জানতে চাইলো, " আমি আপনার দেয়া মার্শাল আর্ট অতি নিষ্ঠার সাথে শিখছি। এ বিষয়ে পুরোপুরি পারদর্শী হতে আমার আর কতদিন লাগবে।
>
> শিক্ষক নির্লিপ্তভাবে উত্তর করলেন, " দশ বছর"। অধৈর্য হয়ে ছাত্রটি তখন বলল, "কিন্তু আমি আরো তাড়াতাড়ি এটা শিখতে চাই। আমি আরো পরিশ্রম করবো। আমি প্রতিদিন চর্চা করবো - প্রয়োজনে দশ কিংবা তার চেয়ে বেশি ঘন্টা করবো। তাহলে কতদিন লাগবে?"
>
> শিক্ষক কিছুক্ষণ চিন্তা করে উত্তর দিলেন, " ২০ বছর।"

ইউরোপীয় সাহিত্যে প্যারাবল

প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্যে দার্শনিক বিষয়াবলী ব্যবহারের জন্য প্যারাবলের ব্যবহার হয়েছে। তবে বাইবেলের প্যারাবলই মূলত ইউরোপীয় সাহিত্যে বড় স্থান দখল করে আছে। উনবিংশ শতকে ডাচ দার্শনিক সোরেন কিয়োর্কেগার্ড তার দার্শনিক বিষয়াবলী সহজে বোঝাতে প্যারাবলের ব্যবহার করেছেন। তলস্তয়, বোর্হেস (যদিও জন্ম আর্জেন্টেনা, মৃত্যু জেনেভায়), কাফকা, আলবেয়ার কামু, অরওয়েল প্রমুখ সাহিত্যিকগণ প্যারাবল চর্চা করেছেন এবং বলা যেতে পারে প্যারাবলের পুনর্জন্ম হয়েছে তাদের হাতেই। এরাই ধর্মীয় গণ্ডি থেকে সাধারণ মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক চিন্তা-চেনা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে প্যারাবল ব্যবহার করেছেন। অবশ্য সক্রেটিস এবং অন্যান্য গ্রিক দার্শনিকেরা আগেই ইহজাগিক প্রেক্ষাপটে প্যারাবলের ব্যবহার করেছেন। লিও তলস্তয়ের গল্প *তিনটি প্রশ্ন* আধুনিক প্যারাবল সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। গল্পটি এ রকম:

> "একদিন এক রাজা ভাবলেন, 'আচ্ছা, যদি আমি জানতাম কোনো কাজ শুরু করার সঠিক সময়টা কখন? যদি জানতাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষটা কে? আর সর্বোপরি, কোন কাজটা করা সবেচেয়ে বেশি প্রয়োজন? তাহলে আমার রাজ্যচালনার কাজে, সেই সাথে ব্যক্তিগত জীবনে কোনো ভুল হতো না!'
>
> তিনি তাঁর রাজ্যজুড়ে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যে, যে তাঁর এই প্রশ্ন তিনটির উত্তর খুঁজে দিতে পারবে তাকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। রাজ্যের সব জ্ঞানী-পণ্ডিত এসে উপস্থিত হলো কিন্তু তাদের সবার কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন উত্তর পাওয়া গেলো।
>
> প্রথম প্রশ্নের জবাবে কেউ কেউ বললো, সঠিক কাজ সঠিক সময়ে করার জন্য আগে থেকেই দিন-তারিখের ছক করে কার্যসূচি লিখে রাখতে হবে এবং তা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। কেউ আবার বললো, প্রতিটা কাজের সঠিক সময় আগে থেকে জানা কখনোই সম্ভব না। যা করতে হবে তা হলো অলস অবসর না কাটিয়ে সময়ের সাথে এগিয়ে যাওয়া। আর যখন যেটি করা প্রয়োজন সেটি করতে হবে।
>
> এবার কেউ কেউ পরামর্শ দিলো, চোখ কান যতই খোলা রাখা হোক না কেন, তবু একার পক্ষে সবসময় কাজের সঠিক সময় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, তাই জ্ঞানী লোকের পরামর্শ নিতে হবে।
>
> কেউ আবার প্রতিবাদ করে বললো, জীবনে কিছু কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মাত্র কয়েক মুহূর্ত সময় বরাদ্দ থাকে। সেক্ষেত্রে জ্ঞানী লোকের পরামর্শ নেয়ার মতো যথেষ্ট সময় হাতে থাকে না। সুতরাং সব কাজের সঠিক সময় জানতে জ্যোতিষীদের নিকট পরামর্শ চাইতে হবে।

একইভাবে দ্বিতীয় প্রশ্নের জন্যেও ভিন্ন ভিন্ন মতামত আসলো। কেউ বললো রাজার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার পরামর্শদাতারা। কেউ বললো যাজক, কেউ ডাক্তার আবার কেউ বা বললো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ তাঁর সৈন্যদল।

তৃতীয় প্রশ্নের জন্য উত্তর আসলো, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বিজ্ঞান শিক্ষা, কেউ বললো যুদ্ধবিদ্যা শেখা আবার কেউ বললো ধর্মীয় আরাধনা।

রাজা সকলের উত্তরের এই বৈচিত্র্যের কারণে কারও সাথেই একমত হতে পারলেন না এবং কাউকে পুরস্কৃতও করলেন না। তবুও তাঁর প্রশ্নগুলোর উত্তর মিলবে সেই আশায় এক সন্ন্যাসীর নিকট যেতে মনস্থির করলেন, যার জ্ঞান ও বুদ্ধির সুনাম রয়েছে রাজ্যজুড়ে।

সেই সন্ন্যাসী বহুদিন যাবৎ এক বনে বাস করতো এবং খুব সাধারণ মানুষ ব্যতীত কেউ সেখানে যেত না। তাই রাজা সাধারণ সাদাসিধে বেশ নিয়ে গেলেন তাঁর কাছে। তাঁর ঘরের অনেক দূরেই ঘোড়া থেকে নামলেন এবং তাঁর দেহরক্ষীদের তাঁর সাথে আসতে মানা করলেন।

রাজা কাছে গিয়ে দেখলেন সন্ন্যাসী তার কুঁড়েঘরের সামনে মাটি খনন করছে। রাজাকে দেখে সে সালাম দিয়ে আবার মাটি কাটতে লাগলো। তাকে খুব ক্লান্ত লাগছিল, প্রতিবার মাটিতে কোঁদাল দিয়ে আঘাত করার সময় সে ভারী নিঃশ্বাস ফেলছিল।

রাজা বললেন, ‘ হে জ্ঞানী সন্ন্যাসী! আমি তোমার কাছে এসেছি আমার তিনটি প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে। বলতে পারো, আমি কোনো কাজের সঠিক সময়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি কী তা কীভাবে জানবো?’

সন্ন্যাসী তাঁর কথা শুনলো কিন্তু কিছুই বললো না। সে মাটি কাটা চালিয়ে গেলো।

রাজা বললেন, ‘ তোমাকে খুব ক্লান্ত লাগছে। তোমার কোদাল দাও, আমি কিছুক্ষণ কাজ করি’।

সন্ন্যাসী তাঁকে ধন্যবাদ জানালো এবং কোদালটি তাঁর হাতে দিয়ে মাটিতে বসে পড়লো। বেশ কিছুক্ষণ কাজ করার পর রাজা থামলেন এবং তাঁর প্রশ্নগুলো আবার করলেন। কিন্তু এবারও সন্ন্যাসী কিছু বললো না। সে কোদাল চেয়ে বললো, ‘ আপনি এবার বিশ্রাম নিন আর আমাকে কাজ করতে দিন।’

কিন্তু রাজা তাকে কোদাল না দিয়ে কাজ করতেই লাগলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেলো। গাছের আড়ালে অস্তায়মান সূর্য উঁকি দিচ্ছিলো।

অবশেষে রাজা থামলেন এবং বললেন, ‘ হে জ্ঞানী সন্ন্যাসী! আমি তোমার কাছে এসেছিলাম উত্তরের জন্য। তুমি যদি প্রশ্নগুলোর উত্তর না জানো তাহলেও বলো, আমি বাড়ি ফিরে যাই’।

সন্ন্যাসী বললো, ‘ কে যেন আসছে! দেখা যাক সে কে!’

রাজা ঘুরে তাকিয়ে দেখলেন একজন দাড়িওয়ালা লোক তার রক্তাক্ত পেটে দু’হাত চেপে দৌঁড়ে আসছে। লোকটি তাদের কাছে এসেই মাটিতে আছড়ে পড়লো। রাজা ও সন্ন্যাসী তার গায়ের পোশাক খুলে দেয়ার পর তার পেটে এক প্রকাণ্ড ক্ষত আবিষ্কার করলেন। রাজা যতটা সম্ভব ভালো করে জায়গাটা পরিষ্কার করে তাঁর নিজের রুমাল ও সন্ন্যাসীর তোয়ালে দিয়ে বেঁধে দিলেন। তাকে পানি পান করালেন।

সন্ধ্যা হয়ে এলে লোকটিকে ঘরে নিয়ে গেলেন। লোকটি কোনো কথা বললো না। রাজা ক্লান্তি বোধ করলেন এবং অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকালে উঠে রাজা নিজে কোথায় তা আবিষ্কার করতে খানিকটা বেগ পেতে হলো। তিনি দেখলেন এক দাঁড়িওয়ালা অচেনা লোক তাঁর দিকে অপলক তাকিয়ে আছে।

লোকটি ক্ষীণকণ্ঠে বললো, ‘ আমাকে আপনি ক্ষমা করে দিন।’ রাজা অবাক হয়ে জবাব দিলেন, ‘ আমি আপনাকে চিনি না। আপনাকে ক্ষমা করার মতো কিছু ঘটেও নি।’ লোকটি বললো, ‘ আপনি আমাকে না চিনলেও আমি আপনাকে চিনি। আমি হচ্ছি আপনার সেই শত্রু যে আপনার উপর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। কারণ আপনি তার ভাইকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন এবং তার সম্পত্তি জব্দ করেছিলেন।

আমি জানতাম আপনি সন্ন্যাসীর সাথে একা দেখা করতে এসেছেন, তাই আমি আপনাকে ফেরার পথে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু গতকাল আপনি আর ফিরলেন না। আপনাকে খুঁজতে আড়াল থেকে বের হলাম এবং আপনার দেহরক্ষীদের কবলে পড়লাম। তারা আমাকে চিনতে পেরে আমাকে আক্রমণ করলো। আপনি আমার ক্ষত বেঁধে আমাকে বাঁচালেন। আপনি যদি চান আমি বাকি জীবন আপনার বিশ্বস্থ দাস হতে পারি। আমি আবারও ক্ষমাপ্রার্থী।’

শত্রুর সাথে এতো সহজেই মিটমাট হওয়াতে রাজা খুব আনন্দিত হলেন। তিনি কেবল তাকে ক্ষমাই করলেন না বরং তার সমুদয় সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন এবং তাকে নিজের দাস ও চিকিৎসকদের অংশীদারি দিলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে রাজা আরেকবার তার প্রশ্নগুলোর উত্তর চেয়ে সন্ন্যাসীর খোঁজ করলেন। সন্ন্যাসী ঘরের বাইরেই হাঁটু গেড়ে বীজ বপন করছিলো।

রাজা বললেন, ‘ আমি শেষবারের মতো তোমার কাছে আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রার্থনা করছি।’

সন্ন্যাসী মুখ ঘুরিয়ে বললো, ‘ উত্তরগুলো তো আপনি ইতোমধ্যে পেয়েই গেছেন।’

রাজা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ উত্তরগুলো পেয়েছি? কীভাবে?’

সন্ন্যাসী বর্ণনা করলো, ‘ লক্ষ্য করুন, আপনি যদি কাল আমাকে মাটি খননে সাহায্য না করে প্রাসাদে ফিরে যেতেন তাহলে ঐ লোক আপনাকে হত্যা করতো। সুতরাং তখন আপনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ছিল যখন আপনি মাটি খনন করছিলেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলাম আমি। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল আমাকে মাটি খননে সাহায্য করা। যেহেতু তা আপনার জীবন বাঁচিয়েছে!’

একটু থেমে সন্ন্যাসী আবার বললো, ‘ আবার আপনি যখন লোকটির ক্ষত বেঁধে দিচ্ছিলেন তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল সেটা আর ব্যক্তি ঐ লোক। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল তাকে সাহায্য করা, যেহেতু তা না হলে সে বাঁচতো না আর আপনাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাও হতো না!’

সন্ন্যাসী আবারও একটু বিরতি নিয়ে বললো, ‘ সুতরাং, মনে রাখবেন, আপনার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হলো বর্তমান মুহূর্তটি কারণ শুধুমাত্র এর উপরই আপনার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলো যে মানুষটার সাথে আপনি এই মুহূর্তে আছেন কারণ আপনি কখনোই জানেন না সেই মানুষটাই আপনার জীবনের শেষ মুহূর্তের সাক্ষী হতে যাচ্ছে কিনা। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো তার জন্য ভালো কিছু করা কেননা এই উদ্দেশ্যেই আমরা এই পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি!’ (উৎস: **www.10minuteschool.com)**

ফ্রানৎস কাফকা আধুনিক প্যারাবল রচয়িতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। কাফকার *আইনের দরজা* একটি বিখ্যাত প্যারাবল। প্যারাবলের সার্বজনতার কথা বলা হয়। এটি সে ধরনের একটি প্যারাবল। এটি অনুবাদ করেছেন তানভীর আকন্দ।

আইনের দরজায় প্রহরী দাঁড়িয়ে। গেঁয়ো এক লোক এসে ভেতরে যাওয়ার আবেদন করলে প্রহরী তাকে বাঁধা দেয় - এই মুহূর্তে ভেতরে যাওয়া সম্ভব নয়। লোকটি কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে জানতে চায়, পরে কোনও এক সময় এলে তাকে ঢুকতে দেওয়া হবে কি না। “ হতে পারে, কিন্তু এখন নয় ”- প্রহরী উত্তর দেয়।

বরাবরের মত সে সময়ও আইনের দরজা খোলাই ছিল। প্রহরী একপাশে সরে দাঁড়ালে লোকটি ঝুঁকে দরজার ভেতওে দেখতে লাগল। ব্যাপারটা খেয়াল

কণ্ঠে প্রহরী হাসতে লাগল, " এতই যদি শখ থাকে, আমার কথা না মেনে ভেতরে ঢুকার চেষ্টা করে দেখতে পার, কিন্তু মনে রেখ আমিও অক্ষম নই। আর কেবল আমিই নই প্রত্যেকটি ঘরের সামনেই প্রহরী রয়েছে, এবং এদের একেকজন অন্যজন থেকে আরও বেশি ক্ষমতাশালী। আমি নিজে এমনকি তৃতীয়জনের একটা পলকও সহ্য করতে পারি না "।

লোকটি এতসব জটিলতা আশা করে নি: আইনের দরজা সর্বদা সকলের জন্যই খোলা থাকা উচিত - সে ভাবে, কিন্তু লোমশ কোট গায়ে প্রহরীকে যখন সে কাছ থেকে দেখে - তার লম্বা খাড়া নাক, পরিপাটি করে সাজানো, দীর্ঘ ও পাকানো কাল দাঁড়ি, প্রহরীর এমন মূর্তি দেখে সে অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রহরী তাকে একটা চেয়ার দেয় বসার জন্য এবং দরজার সামনেই এক পাশে বসার অনুমতি দেয়। সেখানেই সে বসে থাকে দিনের পর দিন বছরের পর বছর। ভেতরে যাবার বহু প্রচেষ্টা চালায়, প্রহরীকে অনুরোধ করতে করতে ক্লান্ত করে তুলে। প্রহরীটি তাকে মাঝে মাঝেই এটা সেটা জিজ্ঞেস করে। তার আবাসস্থল এবং আরও বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চায়। এ সবই গতানুগতিক প্রশ্ন, স্বাভাবিক সৌজন্যতামূলক, ভদ্রলোকেরা যেমন করে থাকে কিন্তু লোকটিকে যে তখনও ভেতরে ঢুকতে দিতে সে অপারগ এ কথাটাও বারবার জানিয়ে দিতে থাকে। লোকটি তার ভ্রমণের পাথেয় হিসেবে সাথে করে যা কিছু এনেছিল, এমনকি বহুমূল্যবান সামগ্রীও সে ঘুষ হিসেবে প্রহরীকে দিয়ে দেয় তাকে প্রলুব্ধ করার জন্যে। প্রহরী সে-সবই গ্রহণ করে কিন্তু বরাবারই বলে যায়, "আমি কেবলমাত্র এইসব নিচ্ছি এ জন্যেই যাতে করে তুমি এমনটা না ভাবো যে চেষ্টার কোনও ত্রুটি তুমি করেছিলে "।

এই এত বছরের মধ্যে লোকটি প্রহরীকে অক্লান্তভাবে পরখ করতে থাকে। সে অন্য প্রহরীদের কথা ভুলেই যায়, এই একজনকেই তার আইনের পথে একমাত্র বাঁধা বলে মনে হয়। সে নিজের দুর্ভাগ্যকে অভিশাপ দিতে থাকে, প্রথম কয়েকবছর রূঢ় এবং উচ্চস্বরেই সে অভিশাপ বর্ষণ করত, ধীরে ধীরে যতই সে বৃদ্ধ হয়ে আসতে থাকে কেবল নিজে নিজেই বিড়বিড় করতে থাকে, তার মধ্যে পাগলামির লক্ষণ ফুটে ওঠে, এত বছর ধরে প্রহরীকে দেখতে দেখতে এমনকি তার কলারে বসে থাকা মাছিগুলোকেও এখন সে চিনতে পারে, সেই মাছিগুলিকেও সে অনুরোধ কণ্ঠে প্রহরীর মন গলিয়ে দেওয়ার জন্যে।

অবশেষে তার চোখের পাতা ভারি হয়ে আসতে থাকে, সে ঠিক বুঝতে পারে না চারপাশের পৃথিবীই কি অন্ধকার হয়ে আসছে নাকি তার দৃষ্টিই তার সাথে প্রতারণা শুরু করেছে। এমনকি এই অন্ধতা সত্ত্বেও আইনের প্রবেশপথ হতে

বিচ্ছুরিত এক অদম্য আভা সে দেখতে পায়। আর বেশি সময় নেই। মৃত্যুর পূর্বে এত বছরের সমস্ত স্মৃতি তার চিন্তার কেন্দ্রবিন্দুতে জড়ো হতে থাকে, একটি প্রশ্ন সে এখনও জিজ্ঞেস করেনি প্রহরীকে। প্রহরীর উদ্দেশ্যে সে হাত নাড়ে, নিজের এই জড়তাগ্রস্থ শরীর নাড়াতেও সে অক্ষম। প্রহরী লোকটিকে কুঁজো হতে হল, দুইজনের উচ্চতার পার্থক্যই লোকটির অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। " বড্ডো নাছোড়বান্দা লোক দেখছি তুমি, কী জানতে চাও বল? "- প্রহরী বলল। লোকটি জিজ্ঞেস করে " আইনের অধিকার পাবার জন্যে সবাই লড়াই করে, কিন্তু এত এত বছরে আমি ছাড়া আর কাউকেই তো আসতে দেখলাম না এখানে? " প্রহরী বুঝতে পারল লোকটির অন্তিম অবস্থা সমাগত। লোকটির কানের কাছে সে চিৎকার করে বলল যাতে তার বিকল ইন্দ্রিয়গুলো সেই শব্দ ধরতে পারে, " আর কেউ কোনও কালেই এখানে প্রবেশের অনুমতি পাবে না, এ তোরণ কেবলমাত্র তোমার জন্যেই তৈরি হয়েছে যা এখন বন্ধ হয়ে যাবে।"

হোর্হে লুইস বোর্হেসের *কিংবদন্তী* প্যারাবলটি পাঠ করে উপলব্ধি করা যেতে পারে আমাদের জ্ঞাত সত্যেও বাইরেও সত্য রয়ে যায় - প্রশ্ন রয়ে যায়।

হাবিল মারা যাবার পর কাবিলের সাথে সাক্ষাৎ। দু'জন একটা মরুভূমির মাঝ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। দু'জনই অনেক লম্বা হওয়ায় দূর থেকে তারা পরস্পরকে চিনতে পারলো। দু'ভাই মিলে মাটিতে বসলো। আগুন ধরালো তারা। এরপর তারা খাওয়াদাওয়া করলো। গোধূলীলগ্ন শুরু হলে বিষন্ন মানুষ যেমন যা করে তেমনভাবে দু'ভাই নীরবে বসে রইলো। এমন সময় তখন আকাশে একটা তারা মিটমিট করে জ্বলে উঠলো। যদিও তখনো তারাটার নাম দেয়া হয়নি। আগুনের আভায় কাবিল হাবিলের কপালে পাথরের আঘাতের দাগটা দেখতে পেলো। দাগটা দেখে মুখে দিতে যাওয়া রুটি কাবিলের হাত থেকে পড়ে গেল। তাকে ক্ষমা করার জন্য ভাইকে অনুরোধ করলো।

"তুমিই কি আমাকে হত্যা করেছ? নাকি আমি তোমাকে হত্যা করেছি?" হাবিল উত্তরে বললো, " আমার এখন আর মনে নাই। আমরা দু'জন এখন একসাথে। আগের মতই।"

"এখন বুঝতে পারছি সত্যিই তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ।" কাবিল বলল, " কারণ ভুলে যাওয়াই ক্ষমা করা। আমিও ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবো।"

"ঠিকই" হাবিল আস্তে উত্তর দিলো, " যতক্ষণ পর্যন্ত অনুশোচনা আর অপরাধবোধ থাকে।"

মজার ব্যাপার হলো সাহিত্য ও দর্শনের বাইরেও বিষয়বস্তু সহজে উপস্থাপনের জন্য প্যারাবলের ব্যবহার দেখা যায়। অর্থনীতিশাস্ত্রে এ ধরনের বিখ্যাত *ভাঙ্গা জানালার প্যারাবল* নামে একটি প্যারাবল লিখেছেন ফরাসি অর্থনীতিবিদ ফ্রেদেরিক বাস্তি ১৮৫০ সালে। এটি অনুবাদ করেছেন গৌরাঙ্গ হালদার। প্যারাবলটি এ রকম:

জেমস গুডফেলো ছিলেন ভালো একজন দোকানদার। তার অমনোযোগী

ছেলেটা যখন জানালার কাচ ভেঙ্গে ফেলেছিল, আপনি কখনো তাকে রাগতে দেখেছেন কি? আপনি যদি ওই ধরনের কোনো একটা দৃশ্যের সামনে উপস্থিত থাকেন, প্রত্যেক দর্শকের মতো আপনিও নিশ্চিতভাবে সেই ঘটনার একজন চাক্ষুষ স্বাক্ষী হবেন। এমন কি সেখানে যদি তিরিশ জনও থাকেন, গড়পড়তা সাধারণ সম্মতিতে, সেই হতভাগা দোকান মালিকের প্রতি এই একইরকম শান্তনাবাক্য শোনাবেন, " ওটা ছিল শয়তানের আছর। ঈশ্বর যা করেন ভালোর জন্যই করেন। সবার বাঁচার হক আছে। এই জানালাটা যদি কখনো না ভাঙ্গতো, তাহলে জানালা মিস্ত্রিরির কী হতো?"

এবার, শান্তনাবাক্যের এই ধরনটির মাঝে একটা সমগ্র তত্ত্ব আছে। তত্ত্বটাকে এই মামুলি ঘটনাটার মাঝেই যুতসইভাবে দেখা যায়। সুখকর না হলেও, আমাদের বেশিরভাগ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যা দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, এটা দেখতে একদম সেই রকম।

মনে করুন, ক্ষয়ক্ষতিটা সারিয়ে নিতে ৬ টাকা খরচ হয়। এবং আপনি বলবেন, দুর্ঘটনাটা মিস্ত্রিরির জন্য ৬ টাকার সংস্থান করেছে। মানে, দুর্ঘটনাটা সেই কাজকে ৬ টাকা সমপরিমাণ উৎসাহ দিয়েছে - আমি একে মঞ্জুর করছি; এর বিরুদ্ধে একটি শব্দও আমার বলার নেই; আপনি ঠিকই বুঝেছেন। মিস্ত্রি এলো। তার কাজ করলো। ৬ টাকা মজুরি নিলো। হাত পরিষ্কার করে খাস দিলে সেই অমনোযোগী বাচ্চাটাকে দোয়া করলো। যা দেখা গেলো এই তার সব।

কিন্তু অন্যদিকে, আপনি যদি উপসংহারে আসেন, জানালা ভাঙ্গা দারুণ একটা কাজ, এটা টাকা সঞ্চালিত হওয়ার কারণ। এবং এই জানালা ভাঙ্গার ফলে, সাধারণভাবে শিল্প কারখানা উদ্দীপনা পাবে, যেহেতু ব্যাপারটা প্রায়ই ঘটে। এবার আপনি চিৎকার করে আমাকে বাধ্য করবেন " ওখানেই থামো! তোমার তত্ত্ব সেখানেই আটকে গেছে যা দেখা গেছে, যা দেখা যায়নি, তোমার তত্ত্বে তার কোনো খতিয়ান নেই।"

এটা দেখা হয়নি যে, যেহেতু আমাদেও দোকানদার একটা জিনিসের জন্য ৬ টাকা খরচ করেছে, সে ওই টাকা আরেকটা জিনিসের জন্য খরচ করতে পারবে না। এটা দেখা হয়নি যে, তাকে যদি জানালা পাল্টাতে না হতো, সে হয়তো তার পুরানো জুতা পাল্টাতো, অথবা তার লাইব্রেরিতে আরেকটা বই যোগ হতো। সংক্ষেপে বললে, কোনো না কোনোভাবে সে এই ৬ টাকা কাজে লাগাতো, যাকে কিনা এই দুর্ঘটনাটা আটকে দিয়েছে।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্যারাবল চর্চা

সাম্প্রতিক বাংলাদেশে মৌলিক প্যারাবল চর্চা চোখে পড়ে কম। কবে কাফকা, বোর্হেস, খহলীল জিবরানের প্যারাবলের অনুবাদ হচ্ছে। এটা আশার দিক। বদরুজ্জামান আলমগীর, রোমেল রহমান, রফিক জিবরান এরা মৌলিক প্যারাবল রচনা করছেন। রোমেল রহমানের গ্রন্থ *মহামারি দিনের প্যারাবল* । বদরুজ্জামান আলমগীরের *হৃদপেয়ারার সুবাস* একটা এক্সপেরিমেন্টাল প্যারাবলের বই। তার একটি প্যারাবল এখানে দেয়া হলো:

মৈজুদ্দিন ও আজরাইল ফেরেশতা

মৈজুদ্দিন দৌড়ের উপর থাকে, যেমন আঙ্গুলের উপরে নখ, তেঁতুল গাছের মগডালে ভূত, নর্তকীর চোখের সামনে ইশারা, সাপের মাথার ফণার শীর্ষে মনি, তেমনি ডুক্কুডুক্কু মনগুড়া - মৈজুদ্দিনের জন্মকর্ম জোয়ারভাটা সবকিছুর ঊর্ধ্বে সত্য-দৌড়।

রীতিমত চার চারটা গ্রামের বড়, মাঝারি গৃহস্থ বাড়ির কর্তা, বৌঝিদের ফুটফরমাশ সবই মৈজুদ্দিনকে সামলাতে হয়; অমুকের বাড়ির নাকউঁচা মেয়েটির বিয়ে হয়েছে-সাত গেরাম পরে বরের বাড়িতে পিঠা নিয়ে যেতে হবে, ১০৩ বছরের বুড়ি হাঁটতে পারে না, মৈজুদ্দিনকে হাঁকাও সে বুড়িকে হাসপাতালে নিয়ে যাবে, নসরুল্লাহ মিয়ারর দক্ষিণী পালানে যে ধান কাটার জন্য এতোগুলি মুনিষ নামানো হয়েছে তাদের দুপুরের খাবার নিয়ে মাঠে যাবে কে- আবার জিগায়- মৈজুদ্দিন! শারমিন ঢেকুর দিয়ে বাড়বাড়ন্ত হয়ে উঠেছে- তার যে এখন অন্তর্বাস লাগবে শারমিনের মা ওই চার গ্রামে কাকে নির্ভয়ে বিশ্বাস করে হাট থেকে অন্তর্বাস আনার জন্য বলতে পারে- ওই আবারো মৈজুদ্দিন!

এই সে মৈজুদ্দিন - তার এমনতো কখনো হয় না- তিনসন্ধ্যার মুখে দৌড়ের মধ্যেই আজ কৈলাগ গোরস্থানের কাছে নারকেল গাছের গোড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গোত্তা খেয়ে বসে পড়ে! চিরদিনের স্বভাবে মৈজুদ্দিন মোচড় দিয়ে জেগে উঠে যেইনা আবার দ্রুত হাঁটতে শুরু করবে তখনই সে পাভাঙা কুকুরের মতো কেমন লেঙচিয়ে ওঠে, আর মনে হয় তার শরীরে কে যেন পেরেক ঠুকে দিয়েছে!

তাজ্জব ব্যাপার, এখনো তার কতো জায়গার কাজ সামলানো বাকি!

কেডায় তুমি, আমার উপর হামলাইয়া পড়ো, পথ ছাড়ো!

আমি আজরাইল!

আজরাইল হও, আর সাদ্দাম হোসেন হও- এখন ভাগো। পরে আইসো। কত মানুষের কতো কাম আমার হাতে পইড়া আছে, অহন ফুটো, পরে আইসো।

আমি জান বিনাশ করি।

মঙ্গলবারের আগে আমার সময় হইবো না, এহন সরো মিয়া!

আমি আজরাইল, আমি সরি না। আজই তোমার খেলা শেষ।

আমারে একটু সময় দেওন যায় না! এক দৌড়ে যামু, এক দৌড়ে আসুম। আগামী মঙ্গলবার ঠিক এইখানে, কথা দিই।

মানুষ সারাজীবনের লাগি চইলা গেলে তার আত্মীয় স্বজনরা কান্নাকাটি করে। আমি পুরাজনম এমন দৌড়ের উপর ছিলাম যে সয়সন্তান কিচ্ছু লইবার পারি নাই।

একটু সময় দেও ভাই, দেখি, নিজের লাগি নিজেই একফোঁটা চোখের পানি ফেলতে যদি পারি!

বর্তমান সময়ে প্যারাবল চর্চার প্রাসঙ্গিকতা

প্রথমত সাহিত্যের কোন শাখায় কে লিখবে তা একেবারেই সাহিত্যিকের মর্জির উপর নির্ভর করে। একজন সাহিত্যিক তার সাহিত্যকর্ম যে ফর্মে প্রকাশ করে পাঠকের কাছে পৌঁছাতে চান সেই ফর্মই তিনি ব্যবহার করবেন। এমনকি শিল্পের জন্য শিল্প রচনায় যারা বিশ্বাসী তারাও এ ফর্মটি ব্যবহার করতে পারেন।

আধুনিক যুগ টেকনোলজির যুগ। অনেকেরই পাতার পর পাতা পড়ার এখন আর সুযোগ ও ধৈর্য নাই। ফলে এই সংক্ষিপ্ত ফর্মটি ব্যবহার করে সহজে পাঠকের কাছে পৌঁছানো যেতে পারে।

বর্তমান সময়ে কর্পোরেট ও পুঁজির দৌরাত্মে নীতি নৈতিকতা এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন। এক্ষেত্রে, প্যারাবল একটা সাহিত্য মাধ্যম হতে পারে। অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সরকার নানা ধরনের গুম, খুন, ভয়ভীতি দেখিয়ে মানুষের কথা বলার স্বাধীনতা ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ রকম জুলুমবাজ সরকারের বিরুদ্ধে লেখালেখির মাধ্যম হিসেবে প্যারাবল ভূমিকা রাখতে পারে।

প্যারাবল হলো একটি দেশের লোকজ জ্ঞান ও তা চর্চার একটা মাধ্যম। 'পাখি কখন জানি উড়ে যায়' কিংবা ' এসব দেখি কানার হাটবাজার' এই ধরনের দার্শনিকতা আর তার উত্তর খোঁজা হতে পারে বাংলা প্যারাবলের উদ্দেশ্য। যা একান্ত নিজস্ব, একান্ত আপন। নিদাঘ চৈত্রে খেতে কাজের ফাঁকে বাবলাগাছের তলায় একটু জিরোতে জিরোতে কৃষকের মনে একান্তে যে প্রশ্নগুলো জমা হয় তার উত্তর হতে পারে বাংলা প্যারাবল। দূর থেকে কলস কাখে করে যে নারী গ্রামের পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে পাওয়া না পাওয়ার যে হিসেব বোনে তা হতে পারে বাংলা প্যারাবল। 'দূরে কোথায় দূরে ---- মন বেড়ায় যে ঘুরে' এর ভাবালুতা আর 'জীবনের সব লেনদেন' এর উত্তর হতে পারে বাংলা প্যারাবল।

তথ্য সহায়ক:

- A Glossary of Literary Terms (9th Edition) – Editors M. H. ABRAMS and Geoffrey Galt Harpham
- Fable, parable, and allegory- Teiji Ichiko
- The Literary Mind - Mark Turner
- Buddhist Mystic Songs – Dr Muhammad Shahidullah
- ফেবল-প্যারাবল এবং কাফকা-থার্বারের এলিগরিক্যাল পাঠ - মোজাফ্ফর হোসেন
- The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary Theory
- The Parable of Jesus, Kafka, Borges, and Others, with Structural Observations - William G. Doty
- Different Sources of Wikipedia and parable related sites from Internet.

গল্প

যুদ্ধদিনে

মিজানুর রহমান নাসিম

দেখতে ঠিক একটা যুদ্ধের শহর। পায়ে দলা অঙ্কুরের মত এই শহর আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আকাশের মুখোমুখি বেশ লাগছে দেখতে। আবার জীবনের ছন্দ পেতে মরিয়া হয়ে ওঠেছে। প্রতিবার আমার কাছে শহরটাকে তাই মনে হয়। আর মনে পড়ে, আমি তখন যুদ্ধদিনের কিশোরী। তারও আগে আমার সোনালু ফুলের মত দুলানো বেণী ছিল। কলা বেণী। মা রোজ হাঁসমার্কা গন্ধরাজ তেল মেখে বিনুনি করে দিতেন। আমার মাথা থেকে ভুরভরে মিষ্টি গন্ধ বের হত। ছেড়ে দেয়া চুলগুলো ছিল রেশমী সূতোর মত পেলব। আয়নায় দেখতাম রেশমী চুলে ছাউনি দেয়া একটি চাঁদমুখ। মুনতাহার মত। আমি কল্পনায় উড়ে উড়ে পাখা ঝাপটিয়ে ফুলে ফুলে গিয়ে বসতাম। নীল আকাশে উড়তো আমার বিশাল ধবল পাখা। এরপর নেমে এল যুদ্ধের নামে মানুষের নিষ্ঠুরতা! আমি থাকতাম শহর থেকে বেশ ভেতরে। অজপাড়াগাঁয়। পাখিডাকা নিভৃত গ্রাম। সত্যিই ফুলপরিদের ওড়াওড়ি ছিল বেশ। ওখানে যুদ্ধের ঝনঝনানি ছিল না। কিন্তু শহরে হাঁটু গেড়ে বসা যুদ্ধ আমাদেরকেও ধীরে ধীরে জানান দিতে থাকে। অল্প ক'দিনেই যুদ্ধ আমাদের শহরের উপর দিয়ে ভয়ানক একটা সুনামি বইয়ে দিয়েছিল। আর তার সীসেভারী বাতাসে আমার দুই বেণীও দিনে দিনে খড়ের দড়ির মত পিঙলে ও খসখসে হয়ে ওঠল। ঠিক যেন আকাদির রোদে পুড়া খসখসে খেজুর পাতার মত। আমার সামনে ছিল সীমাহীন ক্ষুধার দুঃস্বপ্নভরা একেকটা দিনরাত্রি যা নেকড়ের মত আমাকে দিনরাত তাড়া করত। সাফা থেকে মারওয়া কী ভীষণ তৃষ্ণার্ত ছুটাছুটি! কোথাও এক টুকরো মান্না সালওয়া নেই।

এখন আমি যখনই এ শহরে আসি, সোনার কাঠি রূপোর কাঠি বদল করে সেইসব ঘুমন্ত দিনগুলোকে জাগিয়ে তুলি। যুদ্ধের দিনগুলি আমাদের মা-মেয়ের কাছে ছিল বিষম দুঃস্বপ্নের দিন।

এখন শহরে আসতে আমাকে নৌকা থেকে ডাঙায় উঠতে হয়। বিস্তীর্ণ নীল জলের ওপারে শহর। বারবার ভাবি, পৃথিবীর সব শহরগুলো নদী-সাগরের পাড়ে বলেই এত সুন্দর! পৃথিবীর সব বিখ্যাত নদীগুলোর নাম বইপুস্তকে পড়তে পড়তে কল্পনায় বুদ হয়ে যেতাম। এখনো যাই। শিশুকাল সত্যিই আমাকে খুব তাড়া করে।

এই ব্রহ্মপুত্রের ওপার থেকে শহরটা দেখতে কীই-না অপরূপ! অথচ যুদ্ধের দিনগুলোতে সবার কাছে ওটা ছিল স্রেফ মৃত্যুপুরী। নদীর ওপার থেকে তাকিয়েই হয়ত সবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠত। শহরের সবচে' উঁচু পানির ট্যাংকের দিকে তাকিয়ে লোকজনের নাকি বুক ধড়ফড় করত। সে সব দিন চলে গেছে। এখন বদলে যাওয়া সময়ে শহর, নদী, ডাঙা, আকাশ – আবার সবকিছু যুদ্ধহীন মানুষের দখলে! আবার বেঁচে থাকার বিচিত্র আয়োজন। দুনিয়াদারীর ব্যস্ত সমারোহ।

খেয়া থেকে শহরটা খানিক উঁচুতে। পৃথিবীটা যে সমতল নয় সেটা এই খেয়াঘাটে এলেই বুঝা যায়। উত্তরপুর্ব সীমান্তের কর্ণজোড় পাহাড়ের মত রাস্তাটা বেশ উপরে। পথে বড় বড় খোয়া বিছানো। তার ফাঁকে ফাঁকে পা দেবে যাওয়া ধুলো। আজ আমার মনে হল, পাতালপুরের রাজকন্যার মত ব্রহ্মপুত্রের তলদেশ ফুঁড়ে বেরিয়ে শহরে ঢুকছি।

মাঝনদী থেকে শহরটা দেখতে কেমন যুদ্ধ যুদ্ধ সাজ বলে মনে হয়েছিল। যখন জেলারাস্তায় উঠে দাঁড়ালাম ভুল ভাঙল। নাহ্ ঠিকই তো আছে! আসলে আমি ভেবেছিলাম সেই রুক্ষ দিনগুলোর কথা। অনেকদিন আগের শহরে যা কিছু ঘটেছিল। দুঃস্বপ্নময় অতীত আসলে আমাদের ক্ষমা করে না। বারে বারে তার হাতছানি। প্রতিবার নৌকায় আমি এমন অতীত মোহচ্ছন্নতায় আক্রান্ত হই। কি আর করতে পারি আমি, অতীতকে তো বিলকুল উধাও করে দেয়া যায় না! তাও আবার যুদ্ধ। যুদ্ধ মোটেই কোনো মামুলি বিষয় না।

নিশ্চিত বলা যায়, এই জেলা রাস্তা ধরেই তখন মিলিটারি কনভয় টহল দিত। ঘড় ঘড় করে পুতিওয়ালা বেল্টের ট্যাংক চলত। টার্গেট করা এলাকা বা এমনিতেও একটু সন্দেহ হলেই কামানের নল তাক হত নিমেষে। মানুষ হত্যার কী পৈচাশিক নেশা তাদের পেয়ে বসেছিল। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করার, বিকৃত যৌন উল্লাসে মত্ত থাকার একেকটা হিংস্র দানব। জলপাই রঙের জিপে করে শাঁ শাঁ করে ছুটে যাওয়া সেই পীত দানবেরা!

ঐখানে রাস্তার পাশে ধানক্ষেতের চকটার মাঝখানে পুরোনো একটা ইটভাটা ছিল। এখন ভাটাটা আয়তনে অনেক বড়। স্বাধীন দেশ নিশ্চয় পয়মন্ত হবার সুযোগ করে দিয়েছে! ভাটার মাঝখানে শিবলিঙের মত গোল-উঁচু চিমনি। কালো অক্ষরে MBL লেখা। আকাশে চিমনির দাহ-ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে। কয়েকটি মাটির কৃত্রিম টিলা। সেখান থেকে মাটি নিয়ে দলা পাকানো হচ্ছে। এরপর ছাঁচ। পুড়ানোর অপেক্ষায় বিস্তীর্ণ জায়গাজুড়ে বিস্কিটের মত থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয় ওগুলো। ঠিক যেন অন্যরকমের হলোকাস্ট! বেশি না, মাত্র পঞ্চাশ বছর আগের কথা। আমার বয়স

তখন তের। কিন্তু বয়সের তুলনায় বেশ পরিণত চিন্তা ছিল আমার। আর ছিল লড়াই করে টিকে থাকার ইচ্ছেশক্তি। যদিও আমি ঐ মাটির দলার মতই পুড়ে খাঁক হওয়ার অপেক্ষা করছিলাম। পুব বা পশ্চিম, সাদা বা কালো– যুদ্ধের মেয়েরা অমনই হয়।

ইটভাটার পাশে ঐ জায়গাটা মনে হচ্ছে আগে ফাঁকা ছিল। যুদ্ধ শেষে বেশ ক'বছর বাবার সঙ্গে রিক্সায় শহরে যাওয়ার কথা মনে পড়ছে। তখন ওটার পশ্চিম পাশে দুটি পাকিস্তানি সেনা-জিপ পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। চাকা বসে যাওয়া। দুমড়ানো, লণ্ডভণ্ড। ঠিক ভাঙা খেলনার মত। চৌচির হওয়া উইন্ডশিটে ধূলোর পুরু স্তর। পুড়ে যাওয়া সিট কভার। ওদের পরাজয়ের দারুণ এক প্রতীক ছিল ওটা। জিপদুটো নাকি এখন যাদুঘর প্রাঙ্গনে প্রদর্শনীর জন্যে রেখে দিয়েছেন কর্তৃপক্ষ।

কিন্তু অবাক কাণ্ড, যতবারই আমি খেয়াঘাট পার হয়ে জেলারাস্তায় পা রাখি, ততবার জিপদুটো ওখানেই পড়ে থাকতে দেখতে পাই। মনে হয়, ভাগাড়ে পড়ে থাকা মস্ত বড় দুটো মহিষের মাথার কঙ্কাল!

২.

যুদ্ধের পরের বছরের এক সকাল। বাবা আমাকে শহরে নিয়ে যাচ্ছেন। ঠিক ওখানেই আমার কৌতূহল দেখে বাবা রিক্সা থামালেন। রিক্সায় বসেই উঁকি দিয়ে আমি জিপদুটোর ভেতর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকি। ডানাভাঙা মূর্তির মত জিপদুটোর বিবর্ণ দরজা ভাঙা। ভেতরটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। দু'গাড়ির দুটো কালো পুড়া স্টিয়ারিং। পাশে, পেছনে কভারহীন সিটের ধাতব কাঠামো। সবকিছু ছাপিয়ে স্টিয়ারিং দুটোর দিকে আমার দৃষ্টি আটকে গেল। জংধরা বাঁকানো স্টিয়ারিং দুটো যেন অবনত মস্তকের দু'জন বেলুচ জওয়ান। বেদম মার খাওয়া। আপাদমস্তক ভীষণ পরাজিত, ভয়ার্ত! ওরা সবাই নির্মম পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছিল। ইতিহাস ওদের ক্ষমা করেনি। আমার মনে হয়েছিল, মরচেধরা স্টিয়ারিংদুটো যেগুলোকে আমি বেলুচ সৈন্য নামে ডাকছি এ দু'জন ওদেরই সবার আদল। বেলুচ সৈন্য দু'জনে সকল দানবের হয়ে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছে!

এই শহরে ঢুকলে একে এক সব মনে পড়ে। যুদ্ধের মেয়েদের সব মনে রাখতে হয়। আমার গাঁয়ের সেই দিনের কথা। সেদিন ছিল সবে সন্ধ্যা। আমাদের গ্রাম জীবনের চিরাচরিত সন্ধ্যা। ঘন অন্ধকার জেঁকে বসছে। গোয়ালে মশা তাড়ানো ধোঁয়া উড়ছে বেলা থাকতে থাকতেই। ধোঁয়ায় পুরো গ্রামটাই যেন ঢেকে গেছে। রাত এক প্রহর পার হলে এক পশলা দমকা-বৃষ্টি হঠাৎ গাঁয়ের মাথায় আছড়ে পড়ছিল। যেন সাত তাড়াতাড়ি নেমে আসা অন্ধকারকে মুছে দিতে যেতে চায়। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে অন্ধকার আরো জাঁকিয়ে বসল। বৃষ্টির হালকা ছাঁটও তখন থেমে থেমে চলছে। শেষরাতে বৃষ্টি একেবারে ক্ষান্তি দিতেই বুঝা গেল নিশি-পতঙের ক্লান্তি নেই। আরো খানিকটা সময় বিবিধ পতঙের ডাক শীত নামালো চারপাশে। যদিও কাঠচৈত্র পেরিয়ে বৈশাখ।

বেশ শিরশিরে ঠাণ্ডা লাগছিল। আমরা তিন বোনে কাঁথা টেনে নিলাম। হয়ত বাবার চোখে আমরা তিন অপয়া– যারা তার ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা দিতে অপারগ। গাঁয়ের সব মেয়েরাই অবশ্য এমন অপয়াই ছিল। শেষরাতে নাটাকুড়া বিল আপদমস্তক কুয়াশায় ঢেকে আছে। বেরোনোর আগে তাই বাবা অন্ধকারে হাতড়ে চাদরটা বের করলেন। এমন একটা ভঙ্গীতে চাদরটা ঘাড়ে তুলে নিলেন, যেন বলতে চাইছেন, এই আর কী!

ভান করলাম, আমরা সবাই ঘুমে। দেখলাম বাবাও কাউকে জাগাতে চান না। মা'কেও না। বাবা ঘরে পা টিপে টিপে হাঁটছেন। কয়েক মুহূর্ত পর টর্চ নিবিয়ে তিনি চৌকাঠ পেরোলেন। বাবা মনে হয় চা খেতে বাজারে যাচ্ছেন। পরক্ষণে আমি আঁৎকে উঠলাম অন্ধকারে কিসের বাবার চা খাওয়া!

ভোরের আভা আকাশ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। মাঝরাতে এক পশলা বৃষ্টি হঠাৎ নেমে এসেছিল গাঁয়ে। আমি কল্পনা করতে থাকি, গাঁয়ের ভেজা জংলাপথটার দু'পাশে ভুরভুরে সোদাগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে। জংলী ফুলের পাঁপড়িগুলোরও কী ভারী মিষ্টি ঘ্রাণ! অথচ জলা-জংলার বলে আমরা যেমন অপয়া ঠিক তেমনি উপেক্ষিত। বাবার নিজেকে নিশ্চয় মনে হচ্ছে ভীষণ সজীব আর করিৎকর্মা। জুম্মাঘরের চৌচালাটি পেরোনোর সময় তিনি এক চিলতে পিছন ফিরে তাকালেন। তাকাবেনই তো, বাবা তো আর গজারী কাঠ না! মুহূর্তে তাঁর প্রশস্ত শ্যামলা মুখের পেশী টান টান হল। আর এটা আমার দৃষ্টি এড়াল না। তিনি হনহন করে এগিয়ে চললেন। ভোরের আলো ফোটার আগেই দলটা নিয়ে তাঁকে মল্লিকবাড়ি পৌঁছতে হবে। তারপর মহকুমা সদরের নির্দেশনায় পরবর্তী কাজ বা গন্তব্য। তাঁরা কেউই জানেন না কোথায় কতদিন থাকতে হবে। যুদ্ধ মানেই তো অনিশ্চিতি। ছোটবেলার প্লাস্টিকের অক্ষরের মত একটা বড় রঙিন প্রশ্নবোধক চিহ্ন! একই সাথে বিস্ময় আর করুণ তামাশা!

দেড় মাইলের পথ। সেখান থেকে জেলারাস্তাকে ডাইনে রেখে গ্রামের আলপথে ঢুকে পড়তে হবে। আরো চার-পাঁচ মাইল। এ সময় জেলারাস্তা মানে মিলিটারি কনভয়ের মুখোমুখি পড়া। বাবাদের সাত-আট জনের দলটি হনহন করে হাঁটছে। বিলের মাঝখানের পথটা পার হওয়ার সময় কুয়াশামাখা বাতাসের ঝাঁপটা তাঁদের মুখে লাগছে। যাদের গা খালি তাদের গায়ে শীতের কাঁপন ধরার কথা। চারপাশের গ্রাম তখনও জাগে নি।

৩.

ফাঁকা বালিশটায় হাত পড়তেই মা চমকে উঠলেন। এ কেমুন মানুষ গো! ডাকটাও দিবো না? মুনে চাইলো আর সবেরে থুয়ে বারায়ে গেলো গা! একটা বালামুন্দ কতা ত আছে! যুদ্দও কি পুলাপাইন্যা কাম! এই যাওয়া যুদি শেষ যাওয়া অয়! যুদিল যুদ্ধের ময়দানে মানুষটা মইর‍্যে পইড়ে থাহে! যদি তারে টেটাগাঁথার মতো গাঁইতে ফালায়! যুদিল পানির পিপাসায় ছাতি ফাইট্টা মরে! যাবা যাও। বইলে-কয়ে যাও। এইভাবে

বারান নাগবো? নাস্তাপানিটেও ত মুখে পড়লো না। কেরা খাওয়াবো, নাকি না খায়েই থাকা নাগবো? বাসীমুখে একনাগাড়ে মা'র প্রলাপ চলছিল। আমি বলে উঠি, থাক না মা। চলেই তো গেছে আর বলে-কয়ে কী হবে?

মা আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। আহা, মা বুঝতেই চাইছেন না যে এখন এসব অর্থহীন। মা কি জানেন না যে, তাঁর হাতে কোনো কালেই বাবার চলাফেরার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এখনও নেই। এবার আমি বালিশে খানিক মাথা তুলে আবছা অন্ধকারে মা'র দিকে তাকাই। মা'র ঘুমভাঙা চোখে আতংক ধেয়ে আসছে। বাবাকে শেষ এক নজর দেখাটাও বুঝি আর হবে না এই চিন্তায় মা'র মুখটা কালো। বুঝতে পারি, পিপাসায় তাঁর গলা খা খা করছে। অথচ উঠে একটু পানি এগিয়ে দিব তারও উপায় নেই। মা লজ্জা পেয়ে যাবেন। বরং তিনি নিজেই নিয়ে খাক।

বাবার প্রস্থান নিয়ে বিদঘুটে এক চিন্তায় মা'র মাথা ভারি হয়ে আছে। মাথাটা কোনোমতেই তুলতে পারছেন না তিনি। অভিমানও তাঁর বুকে ডুকরে ডুকরে ওঠছে। যদিও মা জানেন, শুধু যুদ্ধে যাওয়া কেন, এমনিও তো তাঁকে কোনদিন গা করে নাই। না স্বামী না অন্য কেউ। বাবা নিজের খেয়াল-খুশিমত যখন যা ইচ্ছা তাই করেছে। স্বামীর বাপ-ভাইয়েরা এতে প্রতিবারই ফুঁলে-ফুঁসে উঠেছে আর বিষ ঢেলেছে তাঁর মগজে। সব দোষ যেন তাঁর। তাঁর কেমন করে দোষ থাকবে? তবু মা কখনও প্রতিবাদ করতে পারেন নি। পারার সাহস তাঁর কোনোদিন ছিল না। মা শুধু চোখের পানি ঝরানোর অকামটাই করতে পারেন, আর কিছু না। তবে মা'র জানা, তিনি হলেন ছফর মুদির ঘানির বলদ, হুকুমের দাসী। সবাই অদৃশ্য চাবুক ঘুরিয়ে হুকুম করে যাবে। তাঁকে সেই হুকুম তালিম করতে হবে কোনো বাক্যব্যয় ছাড়া। ঝড়ুর মা বা পিয়ারীর সাথে তাঁর কোনো পার্থক্য নেই। মা'কে আমার মত করে কে আর বুঝতে পারে?

বিছানায় থ মেরে বসে আছেন মা। পাশে তাঁর একমাত্র ছেলে ঘুমে। মা'র বিশেষ করে বাবার বংশের বাতি। বাবা আমাদের তিন বোনকে কখনোই বাতি হিসেবে ভাবতে চান নি। অবশ্য শুধু বাবাকে দোষ দিয়েই বা কী করি, আমরা তো আসলেই তা হতে পারতেম না। আমরা এক এক বোনে কবে কোথায় কোথায় ছিটকে গেছি! বাতি হতে গেলে তো স্থিতি লাগে, আমাদের স্থিতি কোথায়? পঞ্চাশ বছর আগের মা আর পঞ্চাশ বছর পরের আমি– কীইবা তেমন তফাৎ!

মা এখন কিছুতেই স্বস্তি পাবেন না। আমি যাই বলি, তাঁর মাথায় হড়হড় করে কী সব ঢুকে পড়ছে। একটুও থামাতে পারছেন না মা। স্বামীর শূন্যতা তাঁকে এত পুড়াচ্ছে! আহারে মা বাবাকে এত ভালোবাসেন! মা আমাকে বললেন, বুজলা, চোখের সামনে থাকলেই শান্তি। কও ত আমারে, যুদ্ধে যাওয়া কি সুজা কতা! ফিরে আওয়াও কি এতই সুজা! মা মিনমিন করে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। আমি মা'কে সান্ত্বনা দিতেও ভয় পাই।

মা ঠিকই বলেছেন। যুদ্ধ এমনই ব্যাপার যেখানে নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারবে না তাঁকে কে স্বাগত জানাবে! আমি ভাবতে ভাবতেই দেখি মা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠেন। পর মুহূর্তেই নিজেকে সংযত করেন। আমি কিছুই বলছি না। কেঁদেকুটে মা একটু হালকা হোক।

বাঁশঝাড়-আড়া পাখ-পাখালির চেঁচামেচিতে সরব হয়ে উঠছে। পুবের চৌয়ারি ঘরে চলছে আমার বাবার বাপের একটানা জিকির। সুফি ঘরানার মানুষ তিনি। বাবার বাপের জিকির চলবে বেলা ওঠার আগ পর্যন্ত। তাঁর রোজকার ইবাদত এইভাবে চলে। সকাল ও সন্ধ্যায়– দুইবেলা। বেলাওঠা আর বেলাডুবা। খোদার মুখোমুখি হন তিনি। নাকি নিজেরই মুখোমুখি হওয়া সেটা? দিলের আয়নায় আদমসুরতটার সাক্ষাৎ পেতে চান তিনি।

তখন বাবার বাবা হাত মুখ ধুয়ে জানালার কাছে চেয়ার টেনে বসেছিলেন। ঘরে ঢুকে তাঁর টেবিলে ভাত-তরকারি সাজাচ্ছিলেন মা। বাবার বাপে প্রশ্ন শুরু করলেন। মা যেন তৈরি হয়েই ছিলেন। 'আমারে কইয়্যে যায় নাই।' মায়ের এ কথায় বাবার বাপে দেশলাই কাঠির মতো ফাৎ করে জ্বলে উঠলেন। বাবার বাপে ক্রোধে উন্মাদ। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, বাবার বাপে কী অবলীলায় তাঁর সুফি মূর্তি নিজেই ভেঙে খানখান করলেন!

৪.

অল্প ক'দিনেই গ্রামের জীবন বেশ পাল্টে গিয়েছিল। গাঁয়ের অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর হলেও ঠিক সময়মত রেডিও শুনতে হাজির হত গোঁসাই বাড়ি, খলিফা বাড়ি বা মহুরি বাড়ির দহলে। আমি নিজেও কয়েকবার দৌঁড়ে রেডিও শুনতে গেছি। মা চাচ্ছিলেন আমি যেন না যাই। আমি মাকে বলেছিলাম তাকে এসে যুদ্ধের খবারখবর জানাব। মা হয়ত বাবার কথা স্মরণ করে আমাকে যেতে দিয়েছিলেন। মা কি ভেবেছেন বাবার খোঁজও ওতে জানা যাবে? মা এত বোকা। সরল সোজা মা আমার!

শ শ শ! রেডিওর ভিতরেও কি যুদ্ধ চলছিল? গিয়ে ভিড় দেখে মনে হল লোকজন যেন বয়াতির পালা শুনতে এসেছে। অথচ আগে গান ছাড়া কতজনেই বা রেডিওর সংবাদ শুনত? আমিও শুনতাম না। অথচ তখন যেখানে যা পেতাম কান লাগিয়ে শুনতাম। তার অনেক কিছুই বুঝিনি। এখন বেশ বুঝতে পারি। নিশ্চয় লোকজনে বলাবলি করছিল, শেখ মজিবরকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁকে মেরেই ফেলা হবে। সেই খবর শুনে অফিসের বারান্দায় অস্থিরভাবে পায়চারী করছেন ইন্দিরা গান্ধী। যশোর রোড়ে লম্বা শরণার্থীর মিছিল। রেডিওতে ওসব নতুন নতুন কথা! কিছু কথা আবার লোকমুখে ফুলেফেঁপেও ওঠেছিল।

মহকুমা থেকে আমাদের গ্রাম পাঁচ মাইল। তিন মাইল জেলা সড়ক, দুই মাইল এবড়ো-

থেবড়ো মাটির রাস্তা। তবু কখন আর্মি ঢুকে পড়ে সে কথাও বলছিল সবাই। মা-ও প্রতিদিন কিছু না কিছু বলেন। গাঁয়ের মহিলারা তাঁকে প্রতিদিন কিছু না কিছু নতুন খবর দিয়ে যায়। আতঙ্ক আর দুঃস্বপ্নের ঘোরপ্যাঁচেও হাল-আবাদের আয়োজন চলে। হাটবাজারও বসে। তবে কেমন ভুতুড়ে। বাজারে ক্রেতার চেয়ে খবর সন্ধানী মানুষের সংখ্যাই বেশি। লোকমুখে শহরের সংবাদ হাটে আসত। নানান কান হয়ে আমাদের কানেও পৌঁছে যেত। শহরে ভারি ভারি আর্মি জিপ দিনে রাতে সড়ক কাঁপিয়ে ছুটছে। রেলওয়ে স্টেশন থেকে অস্ত্র-গুলি-রসদ তুলে নিয়ে খালাস হচ্ছে পিটিআই ক্যাম্পাসে। শুধু অস্ত্র না, দল বেঁধে মেয়েদেরও ধরে নিয়ে যাওয়া হত সেখানে। শুনতে শুনতে মা বললেন, খোদার গজব পড়ুক জালেমদের উপর।

৫.

দেখতে দেখতে চারমাস পেরিয়ে গেছে। প্রতিবেশী মহিলারা সকাল বিকাল আসেন। উঠানে বসে গালে হাত দিয়ে কেউ কেউ বিলাপ করে, কবে দ্যাশ স্বাধীন অব? সব মানুশ মইর‍্যে সাফ অইলে অব? মামাডা যে কবে আহে? সুখের দিন পার অইতে দেহা যায় না গো মামি। কস্টের সুময়ই ভারি পাথথর, নরে না!

মা কারো কথায় সাড়া দেন না। মা নির্বিকার পাথর। আজকাল কোন কথাই বুঝি আর তাঁর মাথায় ঢুকে না। মা যখন টলতে থাকেন তখন বুঝা যায় খিদেয় তাঁর শরীররটা কেমন মাটিতে নেতিয়ে পড়ে। এত ক্ষুধা তাঁর পেটে কোথায় লুকিয়ে ছিল? বিয়ের পর থেকে এ বাড়িতে এসে মা দাসীর মত খেটেছে। কাজের চাপে সকালের খাবার দুপুরে, দুপুরের ঠাণ্ডাভাত সন্ধ্যায়। কই তাঁর কখনও তো নিজের খাবারের প্রতি একবিন্দু নজর ছিল না। বরং খাবারটাই প্রায় সময় ঝামেলা মনে হয়েছে। অথচ এখন দুর্দিনে তাঁর হাভাতেপনা মাথাচারা দিয়ে উঠছে। আমাদের সামনে মা অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। মা'র চোখমুখ লজ্জায় কুঁকড়ে যায়। সন্তানদের মুখে খাবার দিতে পারেন না, নিজের খাই খাই! মা রাগে আপনমনে গরগর করেন! তখন আমাকে সব সামলে যেতে হয়।

বয়সের চেয়ে তাই আমি সাত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গিয়েছিলাম। কিশোরী থেকে মা'র মত রমণী। মা পরিণত হতেন বৃদ্ধাতে যিনি কিনা অল্পদিন আগেও অনেক কিছু সামলাতে পারতেন। কত দক্ষ সংসারী ছিলেন মা! সেই মা, শেকড় উপড়ানো চারার মত দিনে দিনে নেতিয়ে পড়ছিলেন। দুঃসময় মানুষকে কত বদলে দেয়!

যুদ্ধের ঝনঝনানি আমাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে ছিল। কিন্তু তার ঢেউ বাতাসে প্রলম্বিত হয়ে আছড়ে পড়ত। যুদ্ধের উন্মাদনা আর নিষ্ঠুরতা আমরা বেশ টের পাচ্ছি। আমাকে এই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে চলতে হচ্ছে। দূর প্রান্তের প্রতিদিনের লড়াই হতাশা আর বিষণ্নতা নিয়ে জানান দেয়। ওসব আমাকে ততদিনে অনেক কথা বুঝার সমর্থ করে তুলছে। সবার সব কথা আমার বুঝা চাই– নতুন নতুন অনেক কথা, অনেক শব্দ। বুঝতে পারি, মা ও ছোট ভাইবোনদের নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে আমাকে

অনেককিছু জানতে হবে। অনেক কঠিন দায়িত্ব আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি তা ধারণ করার জন্যে প্রস্তুত। এতে মা একটু হালকা হতে পারবেন। আমি মা'র কষ্টটা হালকা করে দিতে চাই। মা'র হাতটা দিনে দিনে নুলো হয়ে পড়ছে। মা আর পারছেন না। আমি নিজেকে কল্পনা করি মায়ের শক্তসামর্থ হাতটি নিজের মধ্যে ধারণ করতে। সেই মন্ত্র আমার জানা চাই, যা দুঃসময়ে টিকে থাকতে সাহায্য করবে।

শহর ও আশেপাশে তুমুল যুদ্ধ চলছে। এই গ্রামে থেকেও তা আন্দাজ করা যায়। টাঙ্গাইল রোড থেকে পাথালিয়া– পথে-পগারে পড়ে আছে অসংখ্য মৃতদেহ। শিয়ালে শকুনে টেনে হিঁচড়ে খাচ্ছে লাশ। পথের পাশে ঝোঁপ-জংলায় শিয়াল-শকুনের টানাটানিতে মৃত নারীর পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে সন্তানের অর্ধগলিত দেহ। ধর্ষিত যুবতীর কাটা স্তন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে ভাগাড়ের কীট। পচা লাশের দুর্গন্ধে নাড়িভুড়ি উগলানো বমিতে নাকাল হচ্ছে পথচারী। পুরো দেশটাকে বুঝি জাহান্নামের ভাগাড় বানিয়ে ফেলেছে পিচাশরা!

প্রায় রাতে লাগাতার গুলি-কামানের শব্দে গ্রামটা কেঁপে ওঠে। হঠাৎ সবাই ঘুম থেকে ধড়ফড় করে জেগে ওঠে চৌকিতে জড়সড় হয়ে বসি। ছোটরা ভয়ে কাঁপতে থাকে। আমি ও মা সবাইকে মুরগি ছানার মত জড়িয়ে ধরে অপেক্ষা করতে থাকি। মা সুরা পড়তে থাকেন কখন গোলাগুলি বন্ধ হয়। শেষরাতের মেইল ট্রেনের শব্দেও আমাদের বুক কাঁপে। অথচ আগে ট্রেনের শব্দটা আমাদের ঘুমের মধ্যে ছন্দ তুলে কেমন নাচানাচি করত। বিশেষ করে যখন নানাবাড়িতে থাকতাম, ঝিনাই নদীর লোহার ব্রিজের উপর দিয়ে ছুটে চলা ট্রেনের কী দারুণ ঝমঝমানি! বিশেষ করে রোদেপুড়া দুপুর ও রাতে পৃথিবী খানিকটা অবশ হয়ে গেলে। ভোরে আমরা রেললাইনে গিয়ে সাদা সাদা পাথর কুড়াতাম আর অবাক হতাম। কেমন করে দুটি সরু পাতের উপর দিয়ে বিশাল ট্রেনটি কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছুটে চলে। এখন ট্রেনের ঐ শব্দটাও বুঝি ধ্বংসলীলার অংশ।

চার মাস পার হলেও বাবার সংবাদ পাওয়া গেল না। তবে সবাই বলছে, যুদ্ধ শেষ হতেও বেশি সময় লাগবে না। বাবা ফিরে এলে আমাদের ভয়ানক দিনগুলোর অবসান হতে পারে নিমেষেই। কিন্তু না ফিরলে অপেক্ষা করবে অনেক জটিল হিসেব-নিকেষ। লোকজনের কথাই সত্যি হলো। বাবা তিন-চারদিন আগে খবর পাঠিয়েছেন। তার মানে বাবা বেঁচে আছেন! আমরা সবাই যেন আড়মোড়া কেটে বর্তে ওঠলাম। কিন্তু ক'দিন যেতেই ফের আশার আলোটি মিলিয়ে গেল।

দু'দিনের উপবাস চলছিল। আমি মা'র মত অতবেশি দম ধরে থাকতে পারি না। এক সকালে জেদ ধরলাম নানাবাড়ি যাওয়ার। আমাকে কিছু যোগাড় করতে হবে। মা ভয়ে শিউরে উঠলেন। মা'র বাঁ চোখ লাফাতে লাগল। মা আমাকে কিছুতেই যেতে দিবেন না। আমার জেদ চেপে বসল। এতদিনে আমার মনটা চটি সাবানের মতো শক্ত, খসখসে হয়ে গেছে। কোনকিছুরই ডরভয় আমার নেই। মায়ের মাথাকুটা সত্ত্বেও

আশ্বিনের এক সকালে আমি রওয়ানা দিলাম। সাথে এক প্রতিবেশি মহিলা ছিলেন। তাঁর বাবার বাড়িও ঐদিকে। ওনিও যাবেন কিছু পাওয়ার আশায়।

নানাবাড়ি প্রায় পাঁচ মাইল। দিগন্ত বিস্তৃত বিলের মাঝখান দিয়ে কাঁচা সড়ক। এখানে সেখানে কাঁদা-পানি-কচুরিপানাতে একাকার। কোথাও কোথাও প্রায় কোমর পানি। এতদূর পথ হাঁটা, তার ওপর বিল পার হওয়ার শক্তি আমার নেই। ক্ষুধায় আতংকে প্রতিটি দিন পার করতে করতে অল্প কয়দিনেই আমার জীবনীশক্তি ক্ষয়ে গেছে। কিন্তু সেদিন আমি কোনকিছুকেই তোয়াক্কা করলাম না। পা দুটো ছেঁচড়ে টেনে হলেও আমি থামব না। চোখের পলকে আমরা বড় রাস্তা পার হলাম। তারপর শরণার্থীর মত হাঁটতে হাঁটতে সেই রেললাইন পার হলাম যেখানে আমি শেষবার এসে পাথর কুড়িয়েছি। এবার কুড়াতে এসেছি বেঁচে থাকার রসদ।

পরের দিন সকালে দু'জনে বস্তা কাঁখে বড় রাস্তা পেরিয়ে গ্রামে ঢুকছি। ভাবলেশহীন আমাদের রাস্তাহাঁটা। গুলিকামান ছুটে এলেও আর থামব না। বড় রাস্তা পেরিয়ে অনেকটা পথ ফাঁকা। তার পরে গাঁয়ের বসতি। বড় রাস্তার পাশে বলে মিলিটারি আতংকে অনেক বাড়ি ফাঁকা। কোনো কোনো বাড়িতে মানুষজন থাকলেও চোখে পড়ে না। ফাঁকা রাস্তায় আমরা ধুঁকে ধুঁকে আগাচ্ছি। মনে হয় বিরান মরুভূমি। মাইল পার হলেও জনমানুষের চিহ্ন নেই।

এক সময় ক্লান্তি আমাকে পথ আগাতে দেয় না। একটু পর পর জিরোতে হলো। যেতে যেতে সামনে আবার বিল। বিলের পাড়ে এসে আমার চোখে আগুনের ফুলকি ছুটছে। বিলটা বুঝি এবার আর পার হওয়া যাবে না। মাঝপথে গিয়েই বস্তাসহ ডুবে মরব। আমরা বাঘমারা বিলকেও হারিয়ে দিলাম। পুলসিরাত পার হয়ে বাড়ি পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে বিকাল। শব্দ শুনে মা বের হলেন। বিজয়িনী কিশোরীকে মা বুকে চেপে ধরলেন!

৬.

আমরা কেউই সময়কে আটকে রাখতে পারি না– শত্রু বা মিত্র কেউই না। তুমুল লড়াই চলছে। দু'দিন থেকে যুদ্ধবিমানের আনাগোনা বেড়ে গেছে। দিনে রাতে আকাশ জুড়ে বিকট চীৎকার। মনে হচ্ছে লাগাতার বিদ্যুৎ চমকে আকাশটা বিদীর্ণ হচ্ছে শেষ দিনের মত। ক্ষণে ক্ষণে বর্শার ফলার মত গেঁথে যাচ্ছে পৃথিবীতে।

হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে আমরা ঘুম থেকে একরাতে চীৎকার দিয়ে উঠি। আমার মনে হয়েছিল একটি যুদ্ধবিমান বুঝি মাথার ওপরেই আছড়ে পড়ল! এই আমরা সবাই শেষ! এইসব ক্ষুধা, টিকে থাকা, খবর শোনা আর অপেক্ষা– সব শেষ হতে চলছে। আসলে ওটা সব শেষের পথেই এগোচ্ছিল। পরদিন সকালে জানলাম, শহরে পাক বাহিনীর প্রধান ঘাঁটিতে ফেলা হয়েছিল মিত্র বাহিনীর পাঁচশ পাউন্ডের বোমা। মিগ টুয়েনটি ওয়ান থেকে ছোঁড়া ঐ বোমার আঘাতে শুধু হেডকোয়ার্টার কম্পাউন্ড নয়, ওদের মনোবলেও ফাটল ধরেছে।

পরিস্থিতি বদলে যাচ্ছে দ্রুত। রাত পোহালেই নতুন নতুন খবর। আমরা দারুণ আশাবাদী হতে থাকলাম। হয়ত বিজয়ীর বেশেই বাবা ফিরে আসবেন। মা'র চোখমুখ দেখে বোঝা গেল সেই স্বপ্নেই তিনি বিভোর। তাঁর শুকনো খসখসে মুখটায় কেমন সুখের আমেজ। জয় বা পরাজয়ের ভিন্ন দুটি আবহ সৃষ্টি করার এতই প্রচণ্ড ক্ষমতা যে সেই আবহ দিয়ে আমরা মৃত্যুকূপেও নিমেষে নিজেদের বদলে ফেলি!

সব চোখে চোখে রাখছিলাম। কোন কোন এলাকা শত্রুমুক্ত হয়েছে– এটা আমার চেয়ে ভাল আর কে জানে! দু'দিন যেতে না যেতে ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইলে পাক সেনাদের চরম পরাজয় ঘটল। পরে বুঝেছি, যুদ্ধের সূত্রে এর অর্থ ছিল পাক বাহিনীর কফিনে শেষ পেরেক ঠুকা। কী দামামাই না বাজিয়েছিল এতদিন! আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। ১১ নম্বর সেক্টর ও কাদেরিয়া বাহিনী এখন বিজয়ীর বেশে রাজধানীমুখী। খবর এলো দেশ জুড়ে পাক আর্মিরা নেড়ি কুত্তার মত আত্মসমর্পণ করছে। আমি কল্পনা করলাম তাদের হায়েনাচোখ মাটিতে ঢুকে যেতে চাইছে। ভয়ে আত্মগোপন করছে রাজাকার-আলবদররা। কেউ কেউ পলাতক শেয়ালের মত মারা পড়ছে জনতার হাতে।

নিয়াজির আত্মসমর্পণের খবর এলো। আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়িমুখে ছুটলাম। মা'কে খবরটা এখুনি জানাতে হবে। শুনেই মা খুশিতে আত্মহারা হলেন। মা যেন নিয়াজিকে চিনেন!

মাঘ মাসের হাড় কাঁপানো এক পড়ন্ত বিকেল। মুহূর্তে দু'চার গ্রামে খবর ছড়িয়ে পড়লো মুক্তিযোদ্ধারা আসছেন। দলে দলে লোক রাস্তার পাশে জড়ো হয়েছে তাদেরকে দেখতে। সবার চোখেমুখে আনন্দ-উত্তেজনা উপচে পড়ছে। যদিও অনাগত দিনগুলোর ছবি সবার কাছেই অস্পষ্ট, এমনকি ভাবনারও অতীত।

আমি মা'কে কিছু না বলেই দিলাম ভোঁ দৌঁড়!

ইটভাটার চিমনি থেকে গলগল করে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হয় আকাশটাকে ধোঁয়ার জালে আটকে ফেলবে। বাড়ি যাওয়ার একটা তীব্র ছটফটানি আমাকে পেয়ে বসল। ধূসর জিপদুটো দেখতে দেখতে আমি রিক্সায় উঠে বসলাম। সিটের ফাঁকা জায়গাটায় মা'র মত হাতড়ালাম। আহা বাবা আমাকে কতবার শহরে নিয়ে এসেছিলেন!

একজন যুবকের মনস্তাত্ত্বিক দুর্ঘটনা

শিবলী জামান

রবিউল আওয়ালের আজ বিয়ে। চার বোনের একমাত্র ছোট ভাই। বাড়ির বাতাসে আনন্দ প্রজাপতির রঙিন ডানা হয়ে উড়ছে। পোলাও কোর্মার গন্ধে বাতাস ভারী। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নতুন পোশাক পরে ছোটাছুটি করছে। কিশোরীরা সব শাড়ি পরে সেজেগুজে আকারণেই দলবেঁধে ফিসফিস করছে, অকারণে জোরে জোরে হাসছে। মহিলারা শাড়ি গয়না পরে পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে এ ওর গায়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। নতুন ছাপের শাড়ি পরে কাজের মহিলারা এটা সেটা নিয়ে এদিক ওদিক দৌড়াচ্ছে। যুবকেরা সব রঙ-বেরঙের পাঞ্জাবি পাজামা পরে কাঁধে ওড়না মতো কি একটা ঝুলিয়ে বাড়ির বাইরে জটলা পাকাচ্ছে, গল্প করছে, লুকিয়ে সিগারেট টানছে। মুরুব্বিরা শাদা পাঞ্জাবি পাজামা পরে ব্যস্ত মুখ করে সবাইকে তাড়াতাড়ি বরকে রেডি করে রওনা দেবার জন্য তাড়া দিচ্ছে। বরের বন্ধুরা সব কোট-টাই পরে ফিটফাট।

বাড়িতে বরকে সাজানো হচ্ছে একটা ঘরে। সেই ঘরের ভিতরে, বারান্দায় কোথাও পা ফেলার জায়গা নেই। হাসি ঠাট্টা যেন বাড়িটাকে দখল করে রেখেছে। এত আয়োজন এত আনন্দের মাঝেও রবিউল আওয়ালের মনে একটা আতঙ্ক জেঁকে বসেছে। বিয়ের কথা শুরু হওয়ার পর থেকেই এটা তার মনে মগজে দমকা বাতাসের মতোই মাঝে মাঝে ঢুকে সবকিছু কেমন গোলমাল করে দিচ্ছে। তার চোখে সাত বছর আগের এক সন্ধ্যা ছায়াছবির মত দুলছে। ব্যাপারটা বলি বলি করেও কাউকে বলতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তার কলেজ জীবনের বন্ধু বর্তমানে উঠতি ডাক্তার সাজেদুল ইসলামের বাসায় গতকাল বিকেলে বিয়ের দাওয়াত দিয়ে কথাটা হঠাৎ বলে ফেলেছে । সাজেদুল অবশ্য বলেছে ভয়ের কিছু নেই। এটা এক ধরনের স্নায়ুচাপের কারণে হচ্ছে। এমনিতেই

কেটে যাবে আর যদি কিছু সমস্যা হয় তাহলে তো সে আছেই। অনেকটা ভরসা নিয়ে গত সন্ধ্যায় রবিউল বাড়িতে এলেও এই মুহূর্তে আবার মনের মধ্যে একটা শঙ্কা দোলা দিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সবকিছু ঠিক থাকবে তো! মনে মনে সে আকুল হয়ে আল্লাহকে ডাকছে। বালা-মুসিবত দূর করে দেওয়ার জন্য দোয়া পড়ছে, আয়াতুল কুরসি পড়ে বুকে ফুঁ দিচ্ছে।

হলদি-মেন্‌দি পরানো শেষ হলে গোসল করে নতুন পাজামা পাঞ্জাবি টুপি পাগরি শেরওয়ানি পরে উঠানের কোনায় জাম গাছের নিচে একরাশ উৎকণ্ঠা নিয়ে রবিউল আউয়াল একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। সবাই এসে হাসি মুখে কথা বলছে, ইয়ার্কি ঠাট্টা করছে। রবিউল সামান্য লজ্জা পাচ্ছে। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সে সবার সঙ্গে কথা বলছে। এমন সময় বাড়ির বড় মেয়ে রোকেয়ার স্বামী পান চিবাতে চিবাতে এসে একটা স্টার সিগারেট ধরিয়ে শালার কাছে বসে বললো- লজ্জার কিছু নাই। আজকে তো তোর মহা আনন্দের দিন। বলে সে তার বিয়ের দিনের গল্প শুরু করলো। রবিউল কোন জবাব দিচ্ছে না। মনে মনে দোয়াখায়ের করে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত রোকেয়ার স্বামী সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে বললো- আরে ভয় কি আমি কম পাইছিলাম নাকি- পরে দেখলাম ভয়ের কিছু নাই। বলেই হা হা করে হাসতে লাগলো। দুলাভায়ের কথায় রবিউল হাসতে পারলো না, তার চোখের সামনে বছর সাতেক আগের এক সন্ধ্যার ঘটনা ক্রমে জীবন্ত হয়ে উঠছে। মনের অজান্তেই সে চমকে উঠলো।

এর মধ্যেই বরযাত্রার সব আয়োজন সম্পন্ন করে বরকে নিয়ে সবাই যাত্রা করলো। অল্প সময়ের পথ। সবাই হেঁটেই যাচ্ছিল। রবিউল আওয়াল পালকিতে যাচ্ছিল। মিয়া বাড়িতে বিয়ে, পালকি ছাড়া সে বাড়িতে কোন বর ঢুকবে এটা যেন কেউ চিন্তাও করতে পারেনা। যদিও মিয়া বাড়ির অবস্থা এখন পড়তির দিকে। অন্যদিকে রবিউল আওয়ালদের বার-বাড়ন্ত অবস্থা। দশ বছর আগে হলে এই বিয়ের কথা কেউ ভাবতেই পারতো না। জুম্মার নামাজের আগেই বরযাত্রীরা কনের বাড়িতে উপস্থিত হলো। বেশ ধুমধামের সাথেই বরকে বরণ করে বসানো হলো। কুশলাদি বিনিময় শেষে রঙিন শরবত পানের পর ব্যস্ত হয়ে মুরুব্বিরা মসজিদের দিকে চললো। রবিউল আওয়ালকেও জুম্মার নামাজের জন্য মসজিদে নিয়ে যাওয়া হলো। নামাজ শেষে ইমাম সাহেব সেখানেই বিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন। উভয় পক্ষের কয়েকজন মুরুব্বি অন্দর মহল থেকে মেয়ের এজিন নিয়ে এলো। বিয়ে পড়ানোর পর নব দম্পতির ভবিষ্যৎ সুখ শান্তি কামনা করে ইমাম সাহেব বিশেষ মোনাজাত পড়ালেন। কিন্তু আল্লাহর দরবারে এত দোয়া চাওয়ার পরও রবিউল আউয়ালের মন থেকে সেই ভয়টা কোনমতেই যাচ্ছে না। এমনকি কবুল বলার সময়ও যেন কেউ তার মনের মধ্যে বসে বলছিলো- না, রবিউল আওয়াল না, নিষ্পাপ মেয়েটার এমন সর্বনাশ কইরো না, আল্লাহ সইবো না।

খাওয়া দাওয়ার পর সকলেই খুব খুশি। সবাই বলাবলি করতে লাগলো আহা বড় সুন্দর

জোড়া হইছে। আল্লাহপাক যেন কবুতরের জোড়ার মত মিল করেই এদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছে। পান চিবাতে চিবাতে সবার মুখ থেকেই লাল পিকের সঙ্গে খুশি ঝরে পড়েছে। ওদিকে রবিউল আওয়ালকে নিয়ে যাওয়া হলো অন্দর মহলে। সেখানে যেন আনন্দের আরেক মেলা। অন্দর মহলের সব আনুষ্ঠানিকতা সেরে রবিউল আওয়াল যখন কনে সহ বাড়ির পথ ধরলো তখন সন্ধ্যা হয় হয়। অগ্রহায়ণের হালকা শীত সন্ধ্যার বাতাসে উড়ছে। চারদিকে দ্রুত আঁধার ঘনিয়ে আসছে।

রবিউল আওয়াল এবার আর পালকিতে চড়েনি। নতুন বউ সৈয়দা নাজনীন সুলতানার নিচু স্বরের একটানা কান্নার সুর পালকির ভিতর থেকে রবিউলের কানে ঢুকে মনটাকে ব্যাকুল করে তুলছে। এইতো বাড়ির কাছে এসে পড়েছে প্রায়। আর মিনিট দশেকের মধ্যেই বাড়িতে পৌঁছে যাবে। হঠাৎ তারা একটা ফাঁকা মাঠের মধ্যে এসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে রবিউলের মনের সেই ভয়টা আবার জেগে ওঠলো। তার সারা শরীরে কাঁপুনি দিয়ে উঠলো। তার মনে পড়ে গেল অনেক বছর আগের ঠিক এমনি এক আলোআঁধারি সন্ধ্যার কথা। প্রাণপণে রবিউল আউয়াল কথাটা ভুলে থাকতে চাইলো, কিন্তু আরো যেন স্পষ্ট ছায়াছবরি মতো সেই দৃশ্য তার সামনে জীবন্ত হয়ে উঠলো।

তার মনে পড়তে লাগলো সেই দিনের সন্ধ্যার কথা। সে তখন দক্ষিণ পাড়ার ফাতেমাকে বিকালে পড়াতে যায়। ফাতেমা রুসমত কসাইয়ের বড় মেয়ে। সবে ক্লাস টেনে উঠেছে। রবিউল আওয়াল কয়েক বছর ধরেই তাকে প্রাইভেট পড়াচ্ছে। ফাতেমারও রেজাল্ট ভালো হচ্ছে। শান্ত ভদ্র স্বভাবের ছেলে রবিউল। পড়ানোর বাইরে কোন দিন একটা হাসি ঠাট্টার কথা সে বলেনি। একমনে পড়িয়ে গেছে। ভিতর বাড়ি থেকে ফাতেমার মা প্রতিদিনই কিছু না কিছু চা নাস্তা মাস্টারের জন্য নিজে নিয়ে এসেছে না হয় ফাতেমার ছোট ভাইকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে। বিকালের এই সময়টায় রুসমত বেপারীও উঠানে হাঁটাহাঁটি করতো। মাঝে মাঝে গরু পাইকার আসলে তাদেরকে নিয়ে বাড়ির সামনে টুলে বসে গরু ছাগলের দামদর ঠিক করতো। ভিতর বাড়ি থেকে পান আসতো, কখনও নাস্তা পানিও আসতো । পাইকারা সব সন্ধ্যার মুখে হাসিমুখে বিদায় নিতো। রবিউল আওয়ালও মাগরিব হওয়ার আগেই পড়ানো শেষ করে বাড়ির পথ ধরতো। মাঝে মাঝে উঠানে রুসমত বেপারীর সঙ্গে দেখা হলে সে হাত তুলে সালাম দিতো। বেপারীও সালামের উত্তর দিয়ে রবিউলের বাবার শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতো। কিন্তু কেমন করে যে একদিন ঘটনাটা ঘটে গেল তা আজো রবিউল ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা।

অন্যদিনের মতো সেদিনও রবিউল ফাতেমাকে পড়াচ্ছিলো। আকাশে মেঘ জমায় ঘরটা একটু অন্ধকার ছিল। রবিউল খাতার উপর ঝুঁকে একমনে বীজগণিতের সূত্র বোঝাচ্ছিল। ফাতেমাও টেবিলের অন্যপাশ থেকে খাতার উপর হুমড়ি খেয়ে দেখছিল। হঠাৎ রবিউল খাতা থেকে মুখ তুলতেই দেখলো ফাতেমার মুখটা একেবারে তার মুখের সামনে। এতদিন ধরে সে যে মুখ দেখে এসেছে এ যেন সে মুখ নয়! এ যেন অন্য রকম এক লাবণ্যে ভরা এক নারী। রবিউলের মাথায় আর বীজগণিতের সূত্র ধরা দিচ্ছিল না। হতবিহ্বল হয়ে সে ফাতেমার নিটোল নারী মুখটার দিকে তাকিয়ে

রইলো। হঠাৎ ফাতেমা চোখ তুলতেই দেখলো রবিউলের চোখে কেমন ঘোলা ঘোলা। ফাতেমা একটু ভয় পেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলো। কোনমতে জিজ্ঞেস করলো- আপনার কি হইছে? রবিউল কোন উত্তর দিলনা। হঠাৎ করেই টেবিলটা ঘুরে ফাতেমাকে আচমকা এক ধাক্কায় বিছানার উপর ফেলে দিয়ে জাপটে ধরতে গেলো। ফাতেমা প্রথমে কিছু বুঝতে না পারলেও মুহূর্তেই সামলে নিয়ে এক ঝটকায় রবিউলকে সরিয়ে দিয়ে দৌড়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে রান্নাঘরে মায়ের কাছে ছুটলো। রুসমত কসাই উঠানে দাঁড়িয়ে দশ হাজার টাকা বেশি দিয়ে কালুর লাল ষাঁড়টা কিনবে কিনা ভাবছিলো। মেয়ের এই ছুটে যাওয়া দেখে মুহূর্তেই তাঁর মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল। প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে গরু জবাই করার বড় চকচকে ছুরিটা নিয়ে পড়ার ঘরে গিয়ে দেখলো রবিউল কোনমতে বিছানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে পা বাড়াচ্ছে। রুসমত কসাই ছুরিটা বাগিয়ে ধরে তার দিকে এগুতেই রবিউলের মুখ দিয়ে গোঙানির মতো এ্কটা শব্দ বেড়িয়ে এলো– অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগে সে শুনলো কসাই বলছে– এক পোচে বীচি নামাই দিমু...। রবিউলের জ্ঞান ফিরলে রুসমত কসাই তার গরু দেখাশোনা করে যে ছেলেটা তাকে দিয়ে রবিউলকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল।

খবর রবিউলের বাপের কানেও গেল। দুদিন পরই রবিউলের বড় দুলাভাই তাকে নিয়ে শহরে যায়। সেখানে মেসে থেকে রবিউলের পড়ালেখার ব্যবস্থা করে আসে। মাস খানেকের মধ্যেই টিসি এনে রবিউল নতুন কলেজে ভর্তি হয়ে পড়াশোনায় মন দেয়। দেখতে দেখতে বিএসসিতে ফার্স্টক্লাস পেয়ে যায়। এমএসসিও ভালো মতই শেষ করে। বছর খানেক হলো নিজেদের উপজেলার ফাইজুন্নাহার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে কেমিস্ট্রির প্রভাষক হিসেবে যোগদান করে এই শর্তে যে "অবশ্যই ছয় মাসের মধ্যে বিবাহ করিতে বাধ্য থাকিব"। অল্প দিনের মধ্যেই কলেজের মেধাবী শিক্ষক হিসেবে সুনাম অর্জন করে।

এসব ভাবতে ভাবতেই পালকি রবিউলের বাড়ি প্রবেশ করে। রবিউলের যেন সম্বিত ফিরে। এক মুহূর্তে বাড়িতে হুলুস্থুল পড়ে যায়। বউ দেখতে মাশাল্লাহ, কাঁচা হলুদের মতো গায়ের রঙ, বড় বড় টানা চোখ। মুখখানা যেন একেবারে আসমানের পূর্ণিমা। শরীর স্বাস্থ্যও ভালো। তার উপর বেনারসী আর অলঙ্কারে সাজানো নাজনীন যেন একেবারে ছদ্মবেশী রাজকন্যা। ওদিকে বধুবরণের আনুষ্ঠানিকতা চলছে, রবিউল একা একা উঠোনের কোণায় জামগাছের নিচে এসে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আধবোজা হয়ে ভাবছে অতীতের কথা। সেই দিনের পর থেকে রবিউল মাঝে মাঝেই একটা স্বপ্ন দেখে। সে একটা মাঠের ভিতর দিয়ে প্রাণপণ দৌড়াচ্ছে তাকে উদ্যত চকচকে ছুরি হাতে তাড়া করছে রুসমত কসাই, রবিউল যত জোরে দৌড়ায় রুসমতও তত জোরে দৌড়ায়। আরো জোরে দৌড়াতে গিয়ে আচমকা হোঁচট খেয়ে রবিউল পড়ে যায়। রুসমত উদ্যত ছুরি হাতে তার সামনে এসে দাঁড়ায়। রুসমতের চোখ জবা ফুলের মতো লাল, নাকি কয়লার আগুন– রবিউল আওয়াল ঠিক বুঝতে পারেনা। কসাই ছুরিটা ধীরে ধীরে রবিউলের দু'পায়ের মাঝখানে নামিয়ে আনতে থাকে আর বলে– এক পোচে বীচি নামাই দিমু। তার পর পরই রবিউলের ঘুম ভেঙে যায়। শীত নাই

গ্রীষ্ম নাই রবিউল কুলকুল করে ঘামতে থাকে। শুধু তাই নয় যখনই সে কোন মেয়েকে নিয়ে ভাবে তখনও এই ছবিটা তার চোখে হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠে। সে স্পষ্ট দেখে চকচকে বড় একটা ছুরি তার দু'পায়ের মাঝখানে ধীরে ধীরে নেমে আসছে আর তখনি তার সমস্ত শারীরিক উত্তেজনা বাতাসে মিলিয়ে যায়। ব্যাপারটা সে দু একবার শহরের হোটেলে যেখানে মেয়েমানুষ পাওয়া যায় সেখানে গিয়ে পরীক্ষা করেও দেখেছে। ফলাফল একই।

নতুন বউয়ের সঙ্গে খাওয়ার জন্য রবিউলের ডাক পড়ে। ঘামে ভেজা পাঞ্জাবি নিয়ে হাতমুখ ধোয়ার জন্য কল পাড়ের দিকে আচ্ছন্নের মতো যেতে থাকে। খাওয়ার পর আরো কিছু আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে নব দম্পতিকে বাসর ঘরে দেওয়া হলো। ফুল, রঙিন কাগজ, নানা রঙের সুতাজরি আর স্বল্প আলো দিয়ে এক স্বাপ্নিক বাসর সাজানো হয়েছে। নাজনীন খাটের মাঝখানে ঘোমটা টেনে বসে আছে। তার মুখের একপাশে নীলচে গোলাপী আলো এসে পড়েছে। এক অপার্থিব সৌন্দর্য এসে ভর করেছে তার সমস্ত শরীরে। রবিউল আওয়াল মোহগ্রস্তের মতো খাটের দিকে এগিয়ে যায়। খাটের পাশে গিয়ে ক্ষণিক দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবে। ঠিক তখনই নাজনীন ধীরে ধীরে খাট থেকে নেমে এসে নীচু হয়ে রবিউলকে কদমবুসি করার জন্য আঁচলের নিচ থেকে দু'হাত বের করে। রবিউল নাজনীনের হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে– হঠাৎ তার মাথায় কবিতা ভর করে– নীচু কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলতে থাকে–

"সোনার হাতে সোনার কাঁকন

কে কার অলংকার..."

বলতে বলতে নাজনীনের দিকে এগুতে থাকে তাকে বুকে নেয়ার জন্য। আর ঠিক তক্ষুনি রবিউল লক্ষ্য করে– নাজনীনের হাতে উদ্যত চকচকে সেই ছুরিটা। সঙ্গে সঙ্গেই রবিউল আওয়ালের হিম হয়ে আসতে থাকে, সে ঘামতে শুরু করে, দু'চোখ ঘোলা হয়ে আসতে থাকে – নাজনীন চোখ তুলে তাকায় – কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে–

কি হইছে আপনের?

রবিউল আউয়াল চিৎকার করে কি যেন বলতে যায়– তার গলার শিরা ফুলে উঠে, সামান্য গোঙানির মতো একটু আওয়াজ করতে করতে সে নাজনীনের ভয়ার্ত দৃষ্টির সামনে মেঝেতে ঢলে পড়ে।

অনুবাদ গল্প

তোমার গলায় পেঁচিয়ে থাকা জিনিসটা

চিমামান্ডা নগোজি আদিচে

অনুবাদঃ দিলশাদ চৌধুরী

তোমার মনে হয়েছিলো আমেরিকার সব লোকেদের কাছেই গাড়ি আর বন্দুক আছে; তোমার মামা, চাচা, ফুপু, খালা আর তাদের ছেলেমেয়েরাও তেমনই ভেবেছিলো। আমেরিকান ভিসা লটারি জেতার ঠিক পরেই তাই তারা তোমাকে বলল: একমাসের মধ্যেই তোমার একটা গাড়ি হবে, আর তারপর খুব তাড়াতাড়ি একটা বাড়ি। কিন্তু তুমি আবার ওই আমেরিকানগুলোর মত বন্দুক কিনতে যেওনা।

তারা তোমার লাগোসের ঘরে এসে ভিড় করতে লাগলো যেখানে তুমি তোমার মা, বাবা আর অন্য তিন ভাইবোনের সাথে থাকো। তারা রঙহীন দেয়ালগুলো ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেলো কারণ সবার বসার মত চেয়ার ছিলোনা। তারা এসেছিলো তোমায় উঁচু গলায় বিদায় জানাতে আর নিচু গলায় এটা বলতে যে বিদেশ থেকে তোমায় তাদের জন্য কি কি পাঠাতে হবে। বড় বাড়ি, গাড়ির (আর বন্দুকও অবশ্য) তুলনায় তাদের চাওয়া সামান্যই– এই ছোটোমোটো হাতব্যাগ, জুতা, সুগন্ধি আর পোশাক। তুমি বললে ঠিক আছে, সমস্যা নেই।

তোমার আমেরিকার চাচা, যে কিনা তোমার পরিবারের সবার নাম আমেরিকান ভিসা লটারির জন্য জমা দিয়েছিলো, বলল নিজের পায়ে না দাঁড়ানো অব্দি তুমি তার সাথে থাকতে পারো। সে এয়ারপোর্টে তোমায় নিতে এলো আর হলুদ সরিষা দেয়া একটা বড় হটডগ তোমায় কিনে দিলো যেটা দেখামাত্রই তোমার তীব্র বমিভাব হলো।

আমেরিকার পরিচায়ক, একটা ছোট্ট হাসি দিয়ে সে বলল। মাইনের একটা ছোট

সাদাদের শহরে থাকত সে, লেকের ধারে একটা ত্রিশ বছরের পুরনো বাড়িতে। সে তোমায় বলল যে সে যে কোম্পানিতে চাকরি করে সেখানে তারা তাকে সাধারণের চেয়ে কয়েক হাজার টাকা বেশি বেতন দিতে চেয়েছে, এছাড়া অন্যান্য সুবিধাও কারণ তারা প্রাণপণ চেষ্টা করছিলো তারা যে কত আলাদা সেটা প্রমাণ করতে। তারা তাদের প্রত্যেক প্রচার পুস্তিকায় তার ছবি দিয়েছে, এমনকি সেসব ইউনিটের প্রচারেও যেখানে সে কাজই করেনা। সে হাসতে হাসতে বলল, একটা সাদাদের শহরে জীবনধারণের পক্ষে চাকরিটা ভালোই ছিলো। যদিও আমার স্ত্রীর কালোদের চুল কাটে এমন সেলুন খুঁজতে ঘন্টা পেরিয়ে যেত। কৌতুকটা অবশ্য ছিলো আমেরিকার চরিত্র জানাবার জন্য। এটা বোঝানোর জন্য যে আমেরিকা পুরোটাই দেয়া নেয়ার খেলা। তোমাকে অনেক ছাড়তে হয়েছে ঠিক, কিন্তু বদলে যা পেয়েছ তাও কম নয়।

তিনি তোমায় দেখালেন কিভাবে মূল রাস্তার গ্যাস স্টেশনে ক্যাশিয়ারের চাকরির জন্য আবেদন করতে হয় আর ভর্তি করিয়ে দিলো একটা কমিউনিটি কলেজে। যেখানে স্থুল জঙ্ঘার মেয়েরা লাল নেলপলিশ আর ত্বকে কৃত্রিম রোদে পোড়াভাব আনার লোশন ব্যবহার করে নিজেদের ঠিক যেন কমলালেবুর মত করে তুলেছে। ওরা জিজ্ঞেস করে তুমি ইংরেজি বলতে কোথায় শিখেছ? তোমার কি আফ্রিকায় বাড়ি আছে? আমেরিকায় আসার আগে কোনদিন গাড়ি দেখেছ? ওরা খপ করে ধরে তোমার চুল দেখলো। বেনি খুললে কি এগুলো দাঁড়িয়ে থাকে নাকি বসে যায়? ওরা জানতে চাইছিলো। সব দাঁড়িয়ে যায়? কিভাবে? কেন? তোমার চিরুনি নেই? তুমি কাঠহাসি হাসলে যখন তোমায় প্রশ্নগুলো করা হলো। তোমার চাচা তোমায় আগেই বলেছিলো এমন হবে, জ্ঞানের অভাব আর ঔদ্ধত্য, এগুলোকে তিনি বলেন আর কি। তারপর সে শোনালো তারা এই বাড়িটায় ওঠার ক'মাস পরেই প্রতিবেশীরা কি বলাবলি করছিলো। তারা বলছিলো, আশেপাশের গাছের কাঠবিড়ালিগুলো নাকি সব গায়েব হয়ে যাচ্ছে। তারা নাকি শুনেছিলো, আফ্রিকানরা সব জন্তু জানোয়ার ধরে ধরে খায়।

তুমি তোমার চাচার সাথে হাসতে লাগলে আর মূহুর্তেই তোমার ওই বাড়িটাকে একদম নিজের বাড়ির মতই লাগতে লাগলো। তার স্ত্রী তোমায় ডাকছিলো, নোয়ানো, মানে কিনা বোন। আর তার দুই স্কুলে যাওয়া বাচ্চা তোমায় ডাকলো খালা বলে। তারা ইগবুতে কথা বলছিলো, আর দুপুরে গার্রি খেয়েছিলো, একদম বাড়ির মতই ছিলো সবকিছু। যতক্ষণ না তোমার চাচা ছোট্ট গুদামঘরটায় এলেন যেখানে তুমি পুরনো বাক্স আর কার্টনের মাঝে ঘুমাচ্ছিলে। উনি তোমায় জোর করে নিজের দিকে টানছিলো, তোমার পাছায় চাপ দিচ্ছিলো আর শিৎকার করছিলো। তিনি তোমার আসল চাচা ছিলেননা, তিনি ছিলেন তোমার ফুপুর স্বামীর ভাই, তাও আবার দূর সম্পর্কের। তুমি ওনাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলে, উনি বিছানায় বসলেন। হাজার হোক এটা ওনার বাড়ি --- উনি হেসে হেসে বললেন, বাইশ বছর বয়স তোমার, তুমি আর খুকিটি নেই। তুমি তাকে সুযোগ দিলে সেও তোমায় সুবিধা দেবে। বুদ্ধিমতী মেয়েরা এভাবেই সব আদায় করে। তোমার কি মনে হয়, লাগোসের যেসব মহিলারা ভালো আয়ের চাকরি করে, তারা কিভাবে এত আয় করে? আর নিউইয়র্কের মহিলারা?

তুমি বাথরুমে গিয়ে বসে রইলে, যতক্ষণ না সে ওপরে গেলো। আর পরদিন সকালেই

তুমি ঘর ছাড়লে, এলেমেলো হাওয়ায় ভরা লম্বা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে, লেকের পানিতে ছুটোছুটি করা ছোট ছোট মাছেদের গায়ের ঘ্রাণ নিতে নিতে। তুমি তাকে গাড়ি চালিয়ে যেতে দেখলে, সে সবসময় তোমায় মূল রাস্তা অব্দি ছেড়ে দিতো, কিন্তু আজ আর সে দাঁড়ালো না। তুমি ভাবলে যে সে তার স্ত্রীকে কি বলবে, যে তুমি কেনো চলে গেলে। তারপর তোমার তার বলা কথাটা মনে পড়লো, আমেরিকায় সবই দেয়া নেয়ার খেলা।

তোমার যাত্রা শেষ হলো আরেকটি ছোট শহরে, কানেক্টিকাটে। কারণ যে গ্রেহাউন্ড বাসটায় তুমি উঠেছিলে এটাই তার শেষ স্টপ। উজ্জ্বল, পরিষ্কার ছাউনির একটা রেস্টুরেন্টে তুমি ঢুকে গেলে আর বললে তুমি অন্যান্য নারী পরিবেশকদের চেয়ে দুই ডলার কমে কাজ করে দেবে। কালির মত কালো চুলের ম্যানেজারটার নাম জুয়ান, তার একটা দাঁত সোনায় বাঁধানো যেটা দেখাতে সে অহেতুক একটা হাসি দিয়ে বলল, তার এখানে আগে কখনো কোন নাইজেরিয়ান কাজ করেনি তবে অন্যান্য অভিবাসী যারা তারা ভালোই কাজ করেছে। সে জানে, সে ছিলো। সে তোমায় এক ডলার কম দেবে, কিন্তু টেবিলের নিচ থেকে। কারণ ট্যাক্স দিতে তার ঠিক ভালো লাগেনা।

কলেজে যাওয়ার খরচা তুমি আর বহন করতে পারলেনা কারণ এখন তোমায় নোংরা কার্পেটওয়ালা সরু একটা রুমের ভাড়া দিতে হয়। তাছাড়া ছোট্ট কানেক্টিকাট শহরে কোনো কমিউনিটি কলেজ নেই, আর আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক খরচা। তাই তুমি গণ পাঠাগারে গেলে আর কলেজের ওয়েবসাইটে পাঠ্যক্রম দেখে কিছু বই পড়ে ফেললে। কখনো কখনো তুমি তোমার জোড়া বিছানার ঢলঢলে তোষকের ওপর বসে ভাবতে বাড়ির কথা --- তোমার চাচীরা শুটকি মাছ আর শাক ফেরি করত, ক্রেতাদের পটাতো সেগুলো কেনার জন্য আর যখন তারা কিনতে চাইতোনা, চিৎকার করে গালাগালি শুরু করত; তোমার চাচারা, দেশী মদ খেয়ে এক রুমের একটা বাড়িতে ঠাসাঠাসি করে পরিবার নিয়ে বাস করে। তোমার বন্ধুরা যারা তুমি চলে আসার আগে বিদায় জানাতে এসেছিলো, তোমার আমেরিকান ভিসা লটারি পাওয়ার আনন্দে উল্লাস করতে আর নিজেদের ঈর্ষা কবুল করতে এসেছিলো। তোমার মা-বাবা, যারা প্রতি রবিবার হাত ধরাধরি করে সকাল সকাল গির্জায় যেত আর পাশের ঘরের প্রতিবেশীরা তাদের নিয়ে হাসাহাসি করত। তোমার বাবা যে কিনা কাজ থেকে ফেরার পথে মালিকের পুরনো খবরের কাগজ নিয়ে আসতো আর জোর করে তোমার ভাইদের ধরে পড়াত। তোমার মা, যার বেতনে টেনেটুনে তোমার ভাইদের স্কুলের বেতন দেয়া যেত। মাধ্যমিক স্কুল যেখানে কিনা শিক্ষকদের হাতে বাদামী খাম গুঁজে দিলেই তারা ভালো নাম্বার দিয়ে দিতো।

তোমার কোনদিন ভালো নাম্বার পাবার জন্য টাকা দিতে হয়নি, কখনোই বাদামী খাম নিয়ে মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের দিতে হয়নি। তবুও তুমি ভেবে নিলে লম্বা বাদামী খামের কথা যাতে করে তুমি তোমার মাসের আয়ের অর্ধেক তোমার মা বাবাকে পাঠাতে পারো, প্যারাস্টাটাল অফিসের ঠিকানায় যেখানে তোমার মা পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজ করত। তুমি সবসময় জুয়ানের দেয়া ডলারের নোটগুলো থেকে পাঠাতে কারণ সেগুলো থাকত চকচকে, বখশিশের নোটগুলোর মত না। প্রতিমাসে সাদা কাগজে সাবধান হয়ে তুমি নোটগুলো মোড়াতে কিন্তু কখনোই চিঠি লিখতেনা। লেখার মত

অবশ্য কিছু থাকতোও না।

যদিও পরের দিনগুলোতে, তুমি লিখতে চাইতে। কারণ তোমার কাছে বলার মত গল্প তৈরি হচ্ছিলো। তুমি লিখতে চাইতে আমেরিকানদের অবাক করা খোলা মনের কথা। কত আপনজনের মতই না ওরা বলে ক্যান্সার আক্রান্ত মায়ের কথা, ননদের অকালজাত বাচ্চার কথা; এমনসব কথা যেগুলো প্রকাশ্যে না বলাই উচিত কিংবা শুধুমাত্র পরিবারের শুভাকাঙ্ক্ষী সদস্যদেরই বলা উচিত। তুমি লিখতে চেয়েছিলে কিভাবে মানুষ প্লেটভর্তি খাবার ফেলে রেখে কয়েক ডলারের মোচড়ানো নোট ধরিয়ে দিয়ে যায়, যেন ভিক্ষে দিচ্ছে, যেন নষ্ট খাবারের কাফফারা। তুমি লিখতে চেয়েছিলে কিভাবে একটা বাচ্চা কাঁদতে কাঁদতে দুহাতে নিজের সোনালি চুল টেনে ধরে, টেবিল থেকে মেন্যু ফেলে দেয় আর ওকে চুপ করানোর বদলে ওর বাবা মা উলটো সমর্থন দিতে লাগলো, বাচ্চাটা পাঁচ বছরের হবে হয়ত। তারপর তারা উঠে চলে গেলো। তুমি লিখতে চেয়েছিলে পুরনো পোশাক আর ছেড়া স্নিকার জুতা পরা ধনী লোকেদের কথা যারা দেখতে লাগোসের বড় বাড়িগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ানদের মত বিত্তহীন। তুমি লিখতে চেয়েছিলে ধনী আমেরিকানরা কেমন শুকনো আর দরিদ্র আমেরিকানরা মোটাসোটা। আর খুব বেশি লোকের কাছে বাড়ি-গাড়ি নেই। বন্দুকের ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত নও, কারণ ওটা তাদের পকেটেও থাকতে পারে।

এমনটা নয় যে তুমি শুধু তোমার বাবা মায়ের কাছেই লিখতে চাইতে, তুমি লিখতে চাইতে তোমার বন্ধুবান্ধব, চাচা-চাচী, চাচাতো ভাইবোনদের কাছেও। কিন্তু তোমার কাছে কখনই তাদের জন্য সুগন্ধি, পোশাক, হাতব্যাগ বা জুতা কেনার মত সংস্থান থাকতো না, আর খাবার পরিবেশনকারীর চাকরি থেকে পাওয়া টাকা থেকে ঘর ভাড়াও দিতে হত। তাই আর কাউকেই লিখলেনা তুমি।

কেউ জানতোনা তুমি কোথায়, কারণ তুমি কাউকে বলোনি। মাঝেমধ্যে তোমার নিজেকে অদৃশ্য মনে হত আর তুমি চেষ্টা করতে তোমার ঘরের দেয়াল ভেদ করে হলরুমে যেতে। কিন্তু যখন তুমি দেয়ালে জোরসে ধাক্কা খেতে, সেটা তোমার দুহাতে দাগ রেখে যেত। একদিন জুয়ান জিজ্ঞেস করলো কোনো লোক তোমায় মেরেছে কিনা, তাহলে ও তাকে উচিত শিক্ষা দেবে। তুমি শুনে একটা রহস্যময় হাসি দিয়েছিলে শুধু।

রাতের বেলা, কিছু একটা তোমার গলা পেঁচিয়ে ধরে। তুমি ঘুমিয়ে পড়ার আগে, যেন তোমার শ্বাসরোধ করে ফেলতে চায়।

রেস্টুরেন্টে অনেক লোকই জিজ্ঞেস করেছে যে তুমি কবে জ্যামাইকা থেকে এদেশে এসেছ। কারণ তারা সেই প্রত্যেক কালো মানুষকে জ্যামাইকান ভাবে যাদের ইংরেজি বলার ধরন অন্যরকম। আরও কিছু লোক ছিলো যারা ভাবলো তুমি আফ্রিকান আর বলল যে তারা হাতি ভালোবাসে আর শিকার অভিযানে যেতে চায়।

তাই রেস্তোরার আধো আলোয় বিশেষ খাবারের তালিকা পড়ে শোনানোর পর যখন ও তোমায় জিজ্ঞেস করলো যে তুমি কোন আফ্রিকান দেশ থেকে এসেছ আর তুমি বললে নাইজেরিয়া আর ভাবলে যে এই লোক বলবে যে সে বোতসোয়ানায় এইডস কমাতে টাকা দান করেছে বা এই ধরনের কিছু। কিন্তু ও বলল যে তুমি ইউরোবা নাকি ইগবু,

কারণ তোমার চেহারা ফুলানি সম্প্রদায়ের মত নয়। তুমি অবাক হলে, ভাবলে এ হয়ত আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক। যদিও এ একটু কম বয়সী, বিশের কোটার শেষের দিকে বয়স, কিন্তু তাই কি? ইগবু, তুমি বললে। ও তোমার নাম জিজ্ঞেস করলো, তারপর শুনে বলল, আকুন্না, সুন্দর নাম। ভাগ্য ভালো, সে নামের অর্থ জিজ্ঞেস করেনি। কারণ তুমি শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলে, "বাবার সম্পদ?! মানে তোমার বাবা তোমাকে তোমার স্বামীর কাছে বিক্রি করে দেবে?"

ও তোমায় বলল ও ঘানা, উগান্ডা আর তানজানিয়ায় গিয়েছে। ওকট পি'বিটেকের কবিতা আর আমোস টুটুওলার উপন্যাস ওর খুব ভালো লেগেছে। আর সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলো নিয়ে ও অনেক কিছু পড়েছে, তাদের ইতিহাস, তাদের জটিলতা। তুমি ওর চোখেমুখে তাচ্ছিল্য দেখতে চাইছিলে যেহেতু তুমি ওর খাবার পরিবেশক। কারণ সাদা লোক, যারা আফ্রিকাকে বেশি পছন্দ করে আর যারা আফ্রিকাকে কম পছন্দ করে, দুদলই একই রকম --- দয়া দেখাতে চায়। কিন্তু এই লোক মাইন কমিউনিটি কলেজের অধ্যাপক কোবলডিকের মত করে প্রভুর ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো না, যেমনটা তিনি করেছিলেন একটা ক্লাসে আফ্রিকার বিউপনিবেশায়ন পড়ানোর সময়। ওর মুখের ভাব অধ্যাপক কোবলডিকের মত ছিলোনা, একদমই তেমন ছিলোনা যেমনটা একজন মানুষ নিজেকে তার পরিচিতদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করলে থাকে। ও পরেরদিন আবার এলো, সেই আগের টেবিলেই বসলো। যখন তুমি ওকে জিজ্ঞেস করলে মুরগিটা ঠিক ছিলো কিনা, ও উলটে জানতে চাইলো তুমি লাগোসেই বড় হয়েছ কিনা। তিন নম্বর দিনে ও এসে খাবার অর্ডার দেয়ার আগেই কথা বলা শুরু করে দিলো, বলতে লাগলো কিভাবে ও বোম্বে গিয়েছিলো আর এখন লাগোসে যেতে চায়। দেখতে চায় আসল জীবনে মানুষের বসবাস, ঝুপড়ি ঘরগুলোতে তাদের থাকা। কারণ ও কখনোই বিদেশে গিয়ে সাধারণ টুরিস্টদের মত বোকা বোকা কাজ করতে আগ্রহী হয়নি। ও বলতেই থাকলো, এতটাই বকবক করতে লাগলো যে তোমাকে বলতে হলো এভাবে ওর সাথে কথা বলা রেস্তোরাঁর নিয়মের বিরুদ্ধে। তুমি যখন পানির গ্লাস নামাতে গেলে, ও হালকা করে তোমার হাত ছুঁয়ে দিলো। চার নম্বর দিনে যখন তুমি ওকে আসতে দেখলে, তুমি জুয়ানকে বললে যে তুমি আর ওই টেবিলে কাজ করতে চাওনা। সেইরাতে, তোমার কাজের পরে, ও বাইরে দাঁড়িয়েছিলো কানে ইয়ারফোন গুঁজে। তোমাকে ঘুরতে নিয়ে যেতে চাইছিলো কারণ তোমার নাম হাকুনা মাটাটার সাথে মিলে যায় আর দ্যা লায়ন কিং নির্বুদ্ধিতায় ভরা চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে একমাত্র যেটা তার ভালো লেগেছে। উজ্জ্বল আলোয় তুমি তার দিকে তাকালে আর লক্ষ্য করলে তার চোখের রঙটা এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলের মত, সবুজাভ সোনালি। আমেরিকার এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলই একমাত্র জিনিস যেটা তুমি সত্যিকারের ভালোবেসেছিলে।

ও আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু ক্লাসে পড়ছিলো। তোমাকে ও নিজের বয়স বললো আর তুমি জিজ্ঞেস করলে কেনো ওর পড়াশোনা এখনও শেষ হয়নি। এটা তো আমেরিকা, এখানে তো তোমার দেশের মত অবস্থা নয় যেখানে এত ঘন ঘন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যেত যে মানুষ নিজেদের সাধারণ পড়াশোনার সময়ের সাথে তিন বছর বেশি করে যোগ করে হিসেব করত। যেখানে শিক্ষকেরা হরতালের পর হরতাল করেও বেতন পেতোনা। ও বলল ও কিছুদিন পড়াশোনা বন্ধ রেখে নিজের

ভেতরটাকে জানার জন্য ভ্রমণ করেছে, বেশিরভাগই আফ্রিকা আর এশিয়ায়। তুমি জিজ্ঞেস করলে যে ও নিজেকে কোথায় খুঁজে পেয়েছে শেষ অব্দি। শুনে ও হাসলো, তুমি হাসলেনা। তুমি জানতেনা যে মানুষ চাইলেই এত সাধারণভাবে স্কুলে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, জীবনকে নিজের মত করে চালাতে পারে। তুমি জীবনের দানেই অভ্যস্ত ছিলে, জীবনের নিয়মেই চলছিলে।

পরের চারদিন তুমি ওর সাথে বেড়াতে যেতে অস্বীকৃতি জানালে কারণ যেভাবে ও তোমার মুখের দিকে তাকাতো, তোমার অস্বস্তি হতো। এমন এক প্রগাঢ় ধাঁধায় ভরা চোখে ও তোমার দিকে তাকাতো যে তুমি বাধ্য হতে ওকে বিদায় জানাতে। কিন্তু ওর ওই চাহনি ওর থেকে দূরে সরে যেতেও তোমাকে বাঁধা দিতো। আর তারপর, পঞ্চমদিন রাতে, যখন তুমি ওকে তোমার কাজ শেষে দরজায় দেখলেনা, ঘাবড়ে গেলে। তুমি অনেকদিন পর প্রার্থনা করলে আর যখন ও তোমার পেছন থেকে এসে 'হাই' বললো, তুমি একনিশ্বাসে বললে যে হ্যাঁ, তুমি ওর সাথে বেড়াতে যেতে চাও। আর সেটা বললে ও জিজ্ঞেস করার আগেই কারণ তুমি ভয় পাচ্ছিলে যে ও হয়ত আর জিজ্ঞেস করবেনা।

তারপরের দিন ও তোমায় চ্যাং'স এ রাতের খাবার খেতে নিয়ে গেলো। তোমার ফরচুন কুকি থেকে দুটুকরো কাগজ বের হলো, দুটোই ফাঁকা।

তুমি বুঝতে পারছিলে যে তোমার আর অস্বস্তি হচ্ছেনা যখন তুমি ওকে বললে যে রেস্টুরেন্টের টিভিতে তুমি জিওপার্ডি দেখেছ এবং এই জিনিসগুলোকে সমর্থন করেছ, যথাক্রমে, নানা রঙের মহিলা, কালো পুরুষ, আর সাদা মহিলা, আগে, শেষ অব্দি, সাদা পুরুষ --- যার মানে দাঁড়ায় তুমি কোনদিন সাদা পুরুষদের সমর্থন করোনি। ও হাসলো আর বললো, ওর সমর্থন না পাবার অভ্যাস ছিলো কারণ ওর মা নারী গবেষণা নিয়ে পড়াতেন।

আর তুমি আরও খুলে কথা বলছ বুঝতে পারলে যখন তুমি বললে যে তোমার বাবা আসলে লাগোসের কোনো স্কুল শিক্ষক নন, সে একটা কন্সট্রাকশন কোম্পানিতে নিম্নপদস্থ গাড়ি চালকের কাজ করে। তুমি তাকে বললে সেদিনের কথা, লাগোসের ট্রাফিকে, রিকেটি পগেট ৫০৪, যেটা তোমার বাবা চালাচ্ছিলো। বৃষ্টি পড়ছিলো আর গাড়ির ছাদে মরচেধরা ফুটোর কারণে তোমার সিটটা ভেজা ছিলো।

যানজট ছিলো বেশ, অবশ্য লাগোসে সবসময় যানজট লেগেই থাকে, আর বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। রাস্তাগুলো কাদার পুকুর হয়ে যায় আর তাতে গাড়িগুলোর চাকা আটকে যায়। তোমার চাচাতো ভাইয়েরা সেই সুযোগে বাইরে গিয়ে গাড়িগুলোকে ধাক্কা দিয়ে বেশ টুপাইস কামিয়ে নিতো। বৃষ্টি কাদার কারণে হয়ত তোমার বাবার সেদিন ব্রেক কষতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিলো। ধাক্কাটা বোঝার আগেই তুমি ধাক্কাটা শুনতে পেলে। তোমার বাবা যে গাড়িটায় ধাক্কা দিয়েছিলো সেটা ছিলো বেশ বড়, বিদেশি, গাঢ় সবুজ আর ওটার সোনালি হেডলাইটগুলো যেন কোনো চিতাবাঘের চোখ। অনেক হর্ণ বাজানোর পরেও গাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নিজেকে ঢেলে দেয়ার আগেই তোমার বাবা কান্না শুরু করে দয়া ভিক্ষা করতে লাগলো। দুঃখিত সাহেব,

ক্ষমা করুন সাহেব, সে মন্ত্রোচ্চারণের মত বলতেই থাকলো। আমাকে বা আমার পুরো পরিবারকে বেঁচে দিলেও এর একটা টায়ারের দামও হবেনা, মাফ করে দিন সাহেব।

গাড়ির পেছনের সিটে বসা ধনী লোকটা বের হলোনা, কিন্তু তার ড্রাইভার বেরিয়ে এলো। গাড়ির ক্ষতির পরিমাণ আর তোমার বাবার হামাগুড়ি দেয়া অবস্থা চোখের কোণা দিয়ে দেখে নিয়ে তার অবস্থা হয়েছিলো পর্নো চলচ্চিত্র দেখার মত। দৃশ্যটা দেখে যে সে মজা পাচ্ছে এটা ভেবেই সে লজ্জিত বোধ করছিলো। শেষ অব্দি সে তোমার বাবাকে যেতে দিলো, তাচ্ছিল্যভরে তাড়িয়ে দিলোই বলা চলে। পেছনের গাড়িগুলো হর্ণ বাজাচ্ছিলো আর গালি দিচ্ছিলো। তোমার বাবা যখন গাড়িতে ফিরে এলো, তুমি তার দিকে তাকাতে পারছিলেনা। তাকে বাজারের পাশের ময়লা নালার মধ্যে বসে থাকা শুয়োরের মত লাগছিলো। তোমার বাবা, ঠিক যেন 'নসি', গু।

তুমি এগুলো তাকে বলার পর সে নিজের ঠোঁট টিপে তোমার হাতটা ধরে বললো যে সে বুঝতে পারছে তোমার খারাপ লাগাটা। তুমি একটু বিরক্ত হয়েই হাতটা ছাড়িয়ে নিলে। কারণ ওর মনে হতো পুরো পৃথিবীতে হয়ত সব ওর মতই মানুষ। তুমি ওকে বললে, এখানে বোঝার কিছু নেই। যেমনটা হবার কথা, তেমনই হয়েছে।

হার্টফোর্ড ইয়ালো পেইজে ও একটা আফ্রিকান দোকান খুঁজে পেয়ে তোমায় নিয়ে গেলো। ও এমনভাবে পরিচিতদের মত ঘুরে ঘুরে দেখছিলো, পাম ওয়াইনের বোতলগুলো নেড়ে দেখছিলো যে ওগুলোয় কতটুকু তলানি পড়েছে, যে ঘানা থেকে আসা দোকানের মালিক জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলো যে ও আফ্রিকান কিনা, কেনিয়া কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা আফ্রিকানদের মত। ও বলল হ্যা, কিন্তু ও আমেরিকায় অনেক সময় ধরে আছে। দোকানের মালিক ওর কথা বিশ্বাস করে নেয়ায় ওকে বেশ সন্তুষ্ট মনে হলো। তুমি দোকান থেকে কেনা জিনিসগুলো দিয়ে ওইদিন সন্ধ্যায় রান্না করলে, গার্রি আর ওনুগবু স্যুপ। খেয়ে ও তোমার বেসিনে বমি করে দিলো। তুমি কিছু মনে করলেনা, কারণ তুমি ভাবলে এখন থেকে তুমি তাহলে মাংস দিয়ে স্যুপ রান্না করতে পারবে।

ও মাংস খেতোনা কারণ ও মনে করত যেভাবে ওরা পশুহত্যা করে, সেটা ঠিক নয়। ও বলল ওরা পশুদের মধ্যে ভয়ের বিষ ঢুকিয়ে দেয় যার ফলে ওগুলো খেয়ে মানুষের মৃগী ব্যারাম হয়। বাড়িতে যে মাংস তুমি খেতে, মাংস থাকলে আর কি, সেগুলো ছিলো তোমার একটা আঙুলেরও অর্ধেক। কিন্তু তুমি ওকে তা আর বললেনা। তুমি আরও বললেনা যে তোমার মা দাওয়াদাওয়া দিয়ে সবকিছু রান্না করত কারণ কারিপাতা আর থাইমের অনেক দাম ছিলো। টেস্টিং সল্ট গোছের এমএসজি ছিলো, ওটা দেয়া হত খাবারে। ও বলল, এমএসজিতে ক্যান্সার হয়। এ জন্যই ও চ্যাং'সে খেতে যায় কারণ ওরা রান্নায় এমএসজি ব্যবহার করেনা।

একবার চ্যাং'সে খাবার পরিবেশককে ও বলল যে ও কিছুদিন আগে সাংহাই গিয়েছিলো আর অল্পকিছু মান্দারিন শিখেছে। পরিবেশক খুশি হয়ে ওকে জানালো কোন স্যুপটা সেরা, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আপনার প্রেমিকা কি তাহলে এখন সাংহাইতে?" ও হাসলো, কিছুই বললোনা।

তোমার খাওয়ার সমস্ত ইচ্ছাই নষ্ট হয়ে গেলো, বুকের মধ্যে যেন সব দলা পাকিয়ে যেতে লাগলো। সেই রাতে তোমরা যখন মিলিত হলে, তুমি একটুও শব্দ করলেনা। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সংযত রেখে তুমি ভাণ করলে যেন এসবে তোমার মনই নেই কারণ তুমি জানতে ও চিন্তিত হবে। পরে তুমি ওকে বললে যে কেন তোমার মন খারাপ ছিলো, যে যদিও তোমরা প্রায়ই একসাথে চ্যাং'সে যাও, যদিও মেন্যু আসার ঠিক আগেই তোমরা চুমু খেয়েছিলে, তবুও ওই চাইনিজ লোকটার মনে হয়েছিলো যে তুমি ওর প্রেমিকা হতে পারোনা। আর তাতে ও শুধু মুচকি হেসেছিলো, কিছুই বলেনি। ক্ষমা চাওয়ার আগে ও তোমার দিকে শুন্য চোখে তাকিয়েছিলো, আর তাতেই তুমি জেনে গেছিলে যে ও আসলে কিছুই বোঝেনি।

ও তোমার জন্য উপহার নিয়ে আসে, তুমি যখন দামের কারণে ওগুলো নিতে অস্বীকৃতি জানালে ও বলল যে ওর বোস্টনে থাকা দাদু বেশ ধনী। তারপর তাড়াতাড়ি যোগ করলো যে তবুও বুড়ো এদিক ওদিক অনেককে বিলিয়ে যাওয়ায় যা রেখে গেছে তার অঙ্কটা খুব বড় নয়। ওর আনা উপহার তোমায় ধাঁধায় ফেলে দিতো। একটা হাতের তালুর সমান কাঁচের বল যেটা ঝাঁকি দিলে তুমি একটা ছোট্ট, সুগঠিত গোলাপি পুতুলকে নাচতে দেখতে পেতে। একটা উজ্জ্বল পাথর যেটাকে যে জিনিসের ওপর রাখা হতো, তারই রঙ ধারণ করত। একটা হাতে আঁকা দামি মেক্সিকান ওড়না। শেষ পর্যন্ত তুমি ওকে বললে, তোমার গলা বিদ্রুপ কঠিন হয়ে উঠলো। তুমি বললে যে তোমাদের জীবনে উপহার সবসময় কাজে লাগার মতই হতো। উজ্জ্বল পাথরটা যেমন, কাজে লাগতো যদি ওটা দিয়ে মশলা পেষা যেত। ও জোওে জোরে অনেকক্ষণ ধরে হাসলো, কিন্তু তুমি হাসলেনা। তুমি বুঝলে যে ওর জীবনে ও চাইলে এমন উপহার কিনতে পারে যেগুলো শুধুই উপহার, কাজের কিছু নয়। ও যখন তোমায় পোশাক, জুতো, বই উপহার দিতে শুরু করলো, তুমি নিষেধ করলে। তুমি বললে যে তোমার কোনো উপহারেরই দরকার নেই কিন্তু তবুও ও দিতো। তাই তুমি ওগুলো তোমার চাচাত ভাইবোন, চাচা চাচীদের জন্য রেখে দিতে লাগলে। সেদিনের জন্য যেদিন তুমি সত্যি সত্যি বাড়ি যেতে পারবে। যদিও তুমি জানোনা যে কবে তুমি প্লেনভাড়ার টাকা জোগাড় করতে পারবে, সাথে বাড়িভাড়ার টাকাও। ও বলত যে ও খুব করে নাইজেরিয়া যেতে চায় আর তুমি চাইলে ও তোমাদের দুজনের ভাড়াই দিতে পারবে। তুমি চাইতেনা ও তোমার ভাড়ার টাকা দিয়ে দিক। তুমি চাইতেনা যে ও নাইজেরিয়া যাক, ওর সেসব দেশ ঘোরার তালিকায় আরেকটা নাম যোগ হোক যেসব দেশের গরীব মানুষদের জীবনে ও গিয়ে উঁকি দিয়ে আসে আর সেসব মানুষেরা ওর জীবনের নাগাল অব্দি পায়না। এগুলো তুমি ওকে একটা রৌদ্রজ্বল সুন্দর দিনে বললে, যেদিন ও তোমায় লং আইল্যান্ডের শব্দ শোনাতে নিয়ে গেলো। তোমরা দুজন ঝগড়া করলে, শান্ত জলের সাথে চলতে চলতে তোমার গলা উঁচু হলো। ও বলল যে ওকে "নিজের কাছে ভালোমানুষ সেজে থাকা লোক" বলে ডাকাটা তোমার উচিত হয়নি। তুমি বললে যে ওরও শুধুমাত্র বোম্বের গরীব ভারতীয়দেরই আসল ভারতীয় বলা উচিত নয়। এর মানে কি এটাই যে ও আসল ভারতীয় নয় যেহেতু ও হার্টফোর্ডে দেখা গরীব, মোটা আমেরিকানদের মত নয়। ও তোমার সামনে এগিয়ে গেলো, ওর ধূসর খালি গা, রাবারের জুতা বালি তুলে আনছিলো। কিছুদূর গিয়ে ও ফিরে এলো, তোমার দিকে

হাত বাড়িয়ে দিলো। তোমরা দুজন দুজনকে আদর করলে, চুমু খেলে, দুজন দুজনের চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিলে। ওর চুল নরম, হলুদ, ঠিক যেন পুষ্ট ভুট্টার গাছে ভুট্টার ওপর ঝুলতে থাকা রেশমগুচ্ছের মতো। আর আমারটা কালো, অবাধ্য, যেন জাজিমের ভেতর নারিকেলের খোসা। অনেকক্ষণ রোদে থাকায় ওর ত্বক একটা পাকা তরমুজের রঙ ধারণ করলো আর তুমি ওর পিঠে চুমু খেয়ে তাতে লোশন লাগিয়ে দিলে।

যে জিনিসটা তোমার গলা পেঁচিয়ে ছিলো, ঘুমের ঠিক আগে তোমার গলা টিপে ধরেছিলো, সেটা তোমায় ছেড়ে দিতে আলগা হয়ে আসতে লাগলো।

লোকেদের মুখভঙ্গি দেখেই তুমি বুঝতে লাগলে যে তোমাদের দুজনকে পাশাপাশি অস্বাভাবিক লাগে। মানে যারা ভালো বলত তারা এতটাই ভালো বলত আর যারা খারাপ বলত তারা এতটাই খারাপ বলত, যা ঠিক স্বাভাবিক নয়। এক বৃদ্ধ সাদা দম্পতি যারা বিড়বিড় করছিলো আর ওর দিকে তাকাচ্ছিলো, একটা কালো লোক যে তোমায় দেখে খুব জোরে মাথা ঝাকাচ্ছিলো, এক কালো মহিলা যার চোখে যেন তোমার আত্মসম্মানের অভাব আর নিজের প্রতি ঘৃণার আক্ষেপ ফুটে উঠেছিলো। অথবা সেই কালো মহিলা যে একটা তড়িৎ সংহতির হাসি ফুটিয়ে তুলেছিলো, সেই কালো লোকটা যে খুব কষ্টে তোমায় ক্ষমা করে ওকে একটা দায়সারা সম্ভাষণ জানিয়েছিলো, ওই সাদা দম্পতি যারা এতই হাসিমুখে, এতই জোরে "কি সুন্দর মানিয়েছে" বলেছিলো যেন তারা নিজেদের উদারতা নিজেদের কাছেই প্রমাণ করতে চাইছে।

কিন্তু ওর বাবা মা অন্যরকম ছিলো, তারা তোমাকে অনেকটাই ভরসা করাতে পেরেছিলো যে তোমাদের ব্যাপারটা স্বাভাবিক। ওর মা তোমায় বলল যে ও কখনোই কোনো মেয়েকে তাদের সাথে দেখা করাতে নিয়ে আসেনি একমাত্র ওর মাধ্যমিক স্কুলের নাচের সঙ্গীকে ছাড়া। আর ও তখন একটা বাঁকা হাসি দিয়ে তোমার হাতটা ধরলো। টেবিলের কাপড়টা তোমার হাত ঢেকে রেখেছিলো, ও তোমার হাতে একটা আলগা চাপ দিলো, তুমিও দিলে। তুমি ভাবছিলে ও এমন কাঠ হয়ে রয়েছে কেন, কেন মা বাবার সাথে কথা বলতে গিয়ে ওর এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েলের মত চোখের রঙ গাঢ় হয়ে বদলে যাচ্ছে। যখন ওর মা জিজ্ঞেস করলো যে তুমি নাওয়াল এল সাদাওয়ি পড়েছ কিনা আর তুমি হ্যাঁ বললে, সে খুশি হয়ে গেলো। ওর বাবা জিজ্ঞেস করলো যে নাইজেরিয়ান খাবার আর ভারতীয় খাবারে মিল আছে কিনা, তারপর খাবারের বিল এলে ঠাট্টা করে তোমায় বিল দিতে বললো। তুমি তাদের দিকে তাকালে, তুমি কৃতজ্ঞ ছিলে যে তারা তোমাকে কোনো বিশেষ ট্রফি বা মহামূল্যবান বস্তুর মত করে বিবেচনা করলোনা।

তারপরে ও তোমায় বললো ওর মা বাবার সাথে ওর সমস্যার কথা। কিভাবে তারা জন্মদিনের কেকের মত করে ভালোবাসা ভাগ করে, কিভাবে তারা বলে যে তারা তোমাকে আরেকটু বেশি ভালোবাসবে যদি তুমি আইন পড়তে রাজি হও। তুমি সহানুভূতি দিতে চাইলে, কিন্তু তোমার ওর উপর রাগ হতে লাগলো।

তোমার আরও রাগ লাগলো যখন ও বললো যে ও তাদের সাথে ছুটি কাটাতে এক/দুই

সপ্তাহের জন্য কানাডার কিউবিক কান্ট্রিসাইডে তাদের গ্রীষ্মকুটিরে যেতে রাজি হয়নি। তারা তোমাকেও সঙ্গে নিতে বলেছিলো। ও তোমাকে গ্রীষ্মকুটিরের ছবি দেখালো আর তুমি চিন্তায় পড়ে গেলে যে এটাকে কুটির বলা হয় কেনো! তোমার বাড়ির আশেপাশে এতবড় বিল্ডিং শুধু গির্জা নইলে ব্যাংকের আছে। তুমি হাত থেকে একটা গ্লাস ফেলে দিলে আর সেটা ওর ঘরের শক্ত মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেলো। ও জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে, তুমি কিছু বললেনা।

যদিও তোমার মনে হচ্ছিলো অনেক কিছুই ঠিক হচ্ছেনা। পরে বাথরুমের ঝরনার নিচে তুমি কাঁদতে শুরু করলে। তুমি দেখলে পানি তোমার চোখের জল ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর তুমি জানোই না যে তুমি কেন কাঁদছ।

শেষ অব্দি তুমি বাড়িতে চিঠি লিখলে। একটা ছোট্ট চিঠি মা বাবাকে, কড়কড়ে ডলারের নোটগুলোর মধ্যে, সাথে তুমি তোমার ঠিকানাও দিয়ে দিলে। তুমি উত্তর পেলে কয়েকদিন পরেই, কুরিয়ারে। তোমার মা নিজেই চিঠিটা লিখেছে, তুমি বুঝলে আঁকাবাঁকা হাতের লেখা আর ভুলভাল বানান দেখে।

তোমার বাবা মারা গিয়েছে। সে তার কোম্পানির গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে ছিলো। পাঁচ মাস হতে চললো সে ঘটনার, মা লিখেছে। তারা তোমার পাঠানো টাকার কিছুটা ব্যবহার করেছে একটা ভালো শেষকৃত্য আয়োজনে। একটা ছাগল জবাই করে আত্মীয়দের খাওয়ানো হয়েছে আর একটা ভালো কফিনও কেনা হয়েছে। তুমি গুটিশুটি মেরে বিছানায় শুয়ে পড়লে, হাঁটু দুটোকে বুকের সাথে চেপে ধরলে। মনে করতে চেষ্টা করলে যে তুমি কি করছিলে যেদিন তোমার বাবা মারা গেলো, তুমি কি করছিলে এতদিন যখন সে যারপরনাই মৃত। হয়ত তোমার বাবা সেদিন মারা গিয়েছিলো যেদিন তোমার গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো আতপ চালের মতন, যেটার কোনো ব্যাখ্যা তোমার কাছে ছিলোনা। জুয়ান ঠাট্টা করছিলো, বলেছিলো রাঁধুনীর জায়গায় চুলোর কাছে চলে যেতে যাতে রান্নাঘরের গরম তোমায় উষ্ণ করে দেয়। হয়ত তোমার বাবা সেদিনগুলোর কোন একটিতে মারা গেছে যেদিন তুমি মিস্টিকের রাস্তায় লম্বা সফরে গিয়েছিলে বা ম্যানচেস্টারে নাটক দেখছিলে বা চ্যাং'সে রাতের খাবার খাচ্ছিলে।

ও তোমায় ধরে থাকলো যখন তুমি কাঁদছিলে, তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো, তোমার বাড়ি যাবার টিকেট কিনে দিতে চাইলো আর তোমার সাথে যেতে চাইলো তোমার পরিবারের সাথে দেখা করে সহমর্মিতা প্রকাশ করতে। তুমি নিষেধ করলে, বললে যে তোমার একাই যেতে হবে। ও জিজ্ঞেস করলো যে তুমি ফিরে আসবে কিনা। তুমি ওকে বললে যে তুমি এক বছরের মধ্যে না ফিরলে তো তুমি তোমার গ্রিনকার্ড হারাবে। ও বললো তুমি জানো যে ও কি বোঝাতে চাইছে। তুমি কি ফিরে আসবে? ফিরে আসবে?

তুমি মুখ ঘুরিয়ে নিলে, কিছুই বললেনা। যখন ও তোমায় এয়ারপোর্টে ছাড়তে এলো তুমি ওকে জড়িয়ে ধরলে, একটা পূর্ণ দীর্ঘ সময়ের জন্য তুমি ওকে জড়িয়ে ধরে রইলে, তারপর ছেড়ে দিলে।

গ্রন্থসমালোচনা

হাসিকান্না স্টোরঃ
গতানুগতিকতার ছকে অন্যরকম প্রত্যয়

রুখসানা কাজল

বর্তমান পৃথিবীতে একটি ভয়াবহ আতঙ্ককাল যাপন করছি আমরা। কিছুতেই কিছু ভালো লাগে না। দিনরাত মৃত্যুময়। এরকম এক অসাড় সময়ে হাতে পেলাম 'হাসিকান্না স্টোর' নামক গল্পের বইটি। লেখক সাদাত সায়েম। প্রকাশক বেহুলা বাংলা। প্রকাশকাল ২০২০ সাল। প্রচ্ছদ করেছেন শ. ই. মামুন। ১১টি গল্প নিয়ে রচিত হয়েছে বইটি।

পড়তে গিয়ে গল্পগুলোর আকার দেখে প্রথমে খানিক ধন্দে পড়ে গেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম এটা কোন ছোটগল্পের বই। আসলে তা নয়। তাছাড়া লেখক বা প্রকাশক কোথাও বইটির ধরণ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন উল্লেখ রাখেন নি। তবে এ বইয়ের সবগুলো গল্প পড়ে আমার ধারণা জন্মেছে, এটি একটি অণুগল্পের বই। এ ধারণা পাঠক হিসেবে আমার একান্ত নিজস্ব মতামত। কেননা এ ধরণের গল্পের সাথে আমার দীর্ঘদিনের পাঠ পরিচিতি এবং লেখ্য সম্পর্ক রয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের রাজকুমার বনফুল অর্থাৎ লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যের দরবারে এরকম ছোট ছোট গল্প লিখে গেছেন। অনেকেই তাঁর এ গল্পগুলোকে অণুগল্প বা ঝোরাগল্প নামকরণ করেছে। সে ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রেখে বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে অণুগল্প বা ঝোরাগল্প লেখার চর্চাও হচ্ছে বেশ সযত্ন লেখনীতে। পাঠকদের কাছে জনপ্রিয়তায় অণুগল্প বা ঝোরাগল্প কোন অংশে কম নয়। বরং বর্তমান কর্মব্যস্ত সময়ে অনায়াসে পড়ে শেষ করে ফেলা যায়। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ এবং ভারতের সাহিত্য অঙ্গনে ক্রমশ পাঠকপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠায় অনেক প্রকাশনী অণুগল্পের বই প্রকাশ করছে।

এসব গল্পের মূল মোচড়টি থাকে গল্পের শেষে। যা অনেকক্ষণ ধরে পাঠকের মনে লেপ্টে থাকে। পাঠকের ভাবনার জগতে নানা রঙের ভাবতরঙ্গের দোলা জাগিয়ে এক অদ্ভুত দ্যোতনা সৃষ্টি করে। পাঠক আপ্লুত হয়। কখনো আনন্দে, কখনোবা বেদনা বা প্রতিবাদে। এসব গল্পের প্রতিটি শব্দ লেখক নির্বাচন করেন যথেষ্ট সুচিন্তিতভাবে। আপাত সরল মনে হলেও গল্পগুলো প্রচুর নিগূঢ় অর্থ বহন করতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে বনফুলের 'তাজমহল' গল্পটির কথা বলা যায়। তবে কিনা পাঠকের মনমন্দিরে

আলোড়ন তোলার দায় অনেকটাই থাকে লেখকের লেখা গল্প এবং সুবোদ্ধা পাঠকের পাঠপ্রক্রিয়ার উপর।

লেখক সাদাত সায়েমের 'হাসিকান্না স্টোর' বইয়ের অনেকগুলো গল্পই স্বল্প আকারের। প্রথম গল্পটি শেষ হয়েছে সাকুল্যে দুশ একচল্লিশ শব্দ দিয়ে গাঁথা ছোট বড় চব্বিশটি লাইন দিয়ে। অন্যান্য গল্পগুলোও খুব দীর্ঘ নয়। আর কে না জানে আজ পর্যন্ত অণুগল্পের শব্দসীমা নিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নির্ধারণ নেই। হেমিংওয়ে মাত্র ছয় শব্দ দিয়ে একটি অণুগল্প যেমন লিখেছেন তেমনি নয়শত শব্দ দিয়েও একটি অণুগল্প লিখেছেন। একজন মেক্সিকান লেখক কেবলমাত্র একটি শব্দ রেখে বাকি পৃষ্ঠাটি সাদা রেখে দিয়েছিলেন অণুগল্প হিসেবে। চীনা সাহিত্যে অবশ্য অণুগল্পের শব্দসীমা নিয়ে বলা হয়েছে, একটি সিগ্রেট খাওয়ার সমান সময়ের মধ্যে গল্পটি পড়া শেষ হলে তবেই সেটা অণুগল্প হয়ে উঠবে। সাদাত সায়েমের অনেকগুলো গল্পের আয়ু একটি সিগ্রেটের শেষতম সুখটানের সমান বয়সি। সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই ধারণা হতে পারে যে, এটি কি ঝোরাগল্প বা অণুগল্পের বই!

হাসিকান্না স্টোর-এর কিছু গল্পের স্বাদ আলাদা। সেগুলোতে বর্তমান সময়ের কথা অকপট উঠে এসেছে। নির্মেদ ভনিতাহীন বয়ান। কষ্টকল্পনায় জোর করে লেখা নয় বলেই ভালো লেগেছে। তাই পড়ুয়া পাঠকদের জন্যে গল্পগুলো নিয়ে সামান্য আলোচনা করছি।

প্রথম গল্পের নাম 'হাসিকান্না স্টোর'। পড়তে গিয়ে মনে হয়েছে নিতান্তই সাদামাটা একটি গল্প মাত্র । গল্পে বলা এরকম নাটকীয় ক্রেতা বা বিক্রেতা বাস্তবে কখনও হতেই পারেনা। কিন্তু গল্পটি পড়া শেষ হলে একটি জোরালো ধাক্কা খেয়েছি। এ কি গল্প? নাহ্! এ তো কেবল গল্প নয়! গল্পই যদি হয় তবে তো মেনে নিতেই হয় গুম, খুন, ধর্ষণ, নির্যাতন, প্রতারণা, ফাঁদ, যৌতুক, ধর্ম এবং সামাজিক নিপীড়নসহ কত কিছুর জন্যেইতো প্রতিদিন বাংলাদেশের অনেক মেয়েদের মৃত্যু হয় এবং হচ্ছে। সেগুলো তাহলে সবই গল্প! সাগর রুনি গল্প, তনু গল্প, নার্স তানিয়া গল্প, নুসরাত গল্প! এ গল্পের যে কোন শেষ নেই! আর তখুনি মনে হয়েছে, এ গল্প নিতান্তই গল্প নয়। মৃত্যুগুলো যেহেতু আসল। তাই হাসিকান্না স্টোরও সত্য বয়ানের এক দুঃখ জাগানিয়া মকান। যেখানে একজন দুখি বাবা বা মা, ভাই, স্বামী অথবা স্বজন তাদের অবরুদ্ধ কান্নাগুলো নিত্য ফেরি করে চলেছে।

দ্বিতীয় গল্প 'ওপেন হার্ট সার্জারি'। এটি একটি নিটোল প্রেমের গল্প। যারা প্রেম করেছে বা করছে তারা জানে প্রেমের জন্যে কিভাবে বিনা অস্ত্রে একবার নয় বহুবার হার্ট সার্জারি হয়ে থাকে। এ গল্পে একজন বেকার প্রেমিক নিজেকে উন্মোচন করে দিয়েছে তার প্রেমকে সঠিক ঠিকানা দেওয়ার আশায়। কিন্তু দুলছে আশা নিরাশার দোলাচালে। পড়তে গিয়ে প্রেমিকের মত পাঠকেরও মনে হবে নিশ্চিত প্রত্যাখান ঝুলছে! যদিও শেষ দিকে আশ্বাসের আভাস মেলে। প্রেমিকা একেবারে ফিরিয়ে দেয়নি বেকার প্রেমিককে।

'কংক্রিটের পুল' গল্পটি নগর সভ্যতার সবুজ খেকো দিকটি তুলে ধরেছে। একদিকে বিশ্বব্যাপী ধরিত্রী বাঁচাও আন্দোলন চলছে অন্যদিকে বন মহাবন কেটে, পুড়িয়ে তাদের

হৃদপিণ্ডে কংক্রিটের ঢালাই গেঁথে দেওয়া হচ্ছে। এইত কিছুদিন আগে পুড়ে গেল পৃথি বীর ফুসফুস মহা অরণ্য আমাজান। অথচ মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে সবুজ অরণ্যানী বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বনের পশুকে দিতে বনে থাকার সবুজ গৃহ। আমরা বলছি বটে কিন্তু করছি না। মনুষ্যকৃত সভ্যতার এক আগ্রাসি দিক উঠে এসেছে এ গল্পে।

'মধ্যাহ্নভোজ' এক বাস্তব চিত্র। যদিও নিষ্ঠুর। জীবন থেকে ঝরে গেছে স্বপ্ন। চলে গেছে প্রেম । কিন্তু কোথাও যেনো মায়া জেগে আছে। আর আছে বলেই বই ফেরতের বাহানায় আসা ক্ষুধার্ত দুটি পরিচিতভাইকে আদর করে খেতে ডাকেন গৃহকর্তা। বারো বছর পরেও প্রেমিকা ঝিনুকের চোখে ভেসে ওঠে মুক্তোর মত জলের ঝলক।

'একটুকরো রোদ' পড়ে চমকে গেছি। মৃত্যু আতঙ্ক নিয়ে যে যুবকটি নার্ভাস হয়ে আছে, তার হাতে অচেনা পার্শ্ববর্তনী অদ্ভুত সহজতায় কতগুলো বাদাম তুলে দেয়! বাদাম নাকি জীবনদায়িনী এক সঞ্জীবন আশ্বাসের শেকড়! এই গল্পেরই আরেকটি চুম্বক অংশ রয়েছে। বাসের ভেতর মোলেস্ট হওয়া তরুণী কন্যা ঘরে ফিরে রাগে দুঃখে তার বাবাকে প্রশ্ন করছে, 'তুমি কি কখনো বাসে কোনো মেয়ের গায়ে হাত দিয়েছ?' পুরুষতান্ত্রিক লালচের উপর এক সপাট চপেটাঘাত। কিছু কামতপ্ত পুরুষের অনালোকিত গোপন পাপ যা তার পিতৃত্বকে স্তব্ধ করে দেয়। পৌরুষিক আয়না ধ্বক খেয়ে কেঁপে ওঠে। লেখকের লেখায় আমরা যা বোঝার বুঝে যাই।

এছাড়া 'বুড়ি আনজুমান' গল্প তো আমাদের অতি পরিচিত। কতবার অবহেলা, ঘৃণা, তুচ্ছতায় আমরা পেরিয়ে যাই এসব ভিখেরি বুড়িদের। কে রাখে এদের খোঁজ! এদের কেউ মরে গেলেই বা আমাদের কি করার আছে! ভোগবাদী সমাজে নিজের হিসাব রাখাটাই জরুরী।

'পুষ্পপুরাণ' আমাদের সমাজের দগদগে এক ঘৃণ্য ঘা। বেশ্যাবৃত্তিতেও দক্ষতার প্রয়োজন রয়েছে। আছে ক্লাস। যারা পারে তারা টপ ডেলগাডিনা। সে জিতে যায় ক্ষুধাকে হারিয়ে। এ গল্পের বেশ্যা মেয়েটি পারেনি। গল্পটিতে আরও আছে সাময়িক করুণা মিশ্রিত কৌতূহল ও সহানুভূতির মৃদু অথচ ভীরু ইঙ্গিত। তাইতো ফারুক সাহেব ধর্ষিতা ডেলগাডিনাকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখে অসাহসে রিক্সা ঘুরিয়ে ফিরে চলে আসেন।

'পদ্মার ওপারে' গল্পটি এক ছন্নছাড়া যুবকের ভুল ভালোবাসা নিয়ে লেখা। কিম্বা প্রেম নিয়ে প্রেমিকা মেয়েটির ইম্ফ্যাচুয়েশন। হরহামেশা যেরকম হয়ে থাকে। তবু বেদনার সাথে প্রেমিকের সময় যাপন পাঠককে ব্যাথাতুর করে তুলবে।

'স্থানান্তরে' 'ইশ্‌কুল' 'এখন বিকাল' গল্পগুলোতে উঠে এসেছে রাষ্ট্র, সমাজ এবং ব্যক্তিক পর্যায়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্যের কথা। যা আমাদের সমাজে নিয়ত ঘটছে। শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, প্রত্যাখানের পাশাপাশি চলছে চিরকালীন প্রথার ব্যবহার।

সমগ্র বইটি পাঠ করে নিশ্চিত একটি ধারণা পেয়েছি। পেয়েছি বললে অন্যরকমের ঠেকবে। গল্পগুলোই আমাকে এই ধারণা দিয়েছে। তা হলো, লেখকের অনুভূতির কলম সঠিক ব্যবচ্ছেদ করতে জানে। মানুষের মন, ব্যক্তিগত ভাবনার জগতসহ রাষ্ট্র ও

সমাজের নানাবিধ ছল, চাতুরি, বৈষম্য নিয়ে লেখকের কলম লিখে যেতে চায়। লেখক নিজেই বলেছেন, যে জীবন এবং মৃত্যু তাঁর মনোজগতে ধরা পড়েছে তিনি তারই পুনর্নির্মাণ করেছেন। এ কারণেই তাঁর গল্পে এত বাস্তবতার ছড়াছড়ি। গল্পের ভাষা ও শৈলী সাধারণ ও চলমান সময়ের গদ্য। তবে কখনও কখনও মনে হয়েছে, গল্পগুলো স্থিতি (Status) মূলক। এরপরেই মূল গল্প শুরু হবে। থাকবে পরতে পরতে ঘন বুনোট। বাস্তবে লেখক খুব বেশি মিতব্যয়ি। রস আস্বাদনের শুরুতেই গল্পের যবনিকা টেনে দিয়েছেন। তাছাড়া অধিকাংশ গল্পই আমিত্বপূর্ণ। তাতে ত্রুটির কিছু নেই; গুরু তো বলেই গেছেন, আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙ্গা হয়ে, আমি চোখ মেললুম, আকাশে জ্বলে উঠল আলো পূবে পশ্চিমে...

তবে গল্পগুলো উপভোগ্য। গতানুগতিকতার ছকে অন্যরকম একটি প্রত্যয় রয়েছে। ভরসা এই যে, লেখক গল্পের বিষয় বাছতে জানেন। বিষয় বৈচিত্র্য না থাকলে কোন বই – সে গল্প, কবিতা বা অণুগল্পেরই হোক না কেন – ভালো লাগে না।

ভাঁটফুল থেকে প্রকাশিত ই-বই:

শাহবাগ মন উদ্বাগ : ইচক দুয়েন্দে

দূরত্বের সুফিয়ানা : বদরুজ্জামান আলমগীর

এগারো সিন্দুর : রফিক জিবরান

তিন ডানাওয়ালা পাখি : রফিক জিবরান

পিপাসার জিনকোড : সাদাত সায়েম

মাটির উনুন ও যুবকের ওম : সৈয়দা হাবিবা

ভাঁটফুল থেকে প্রকাশিতব্য ই-বই:

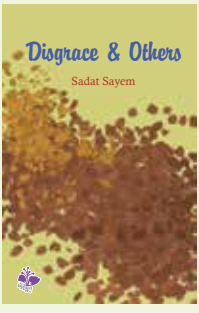

বইগুলো পেতে ভিজিট করুন:

www.bhatphul.com